VOL-1, No- 1
প্রথম বর্ষ, প্রথম খন্ড ঃ প্রথম সংখ্যা,
ডিসেম্বর ২০১২

ISSN : 2319-8591
আই.এস.এস.এন ঃ ২৩১৯-৮৫৯১

PURVA BHARAT

পূর্বভারত

(মানুষ ও সংস্কৃতি)

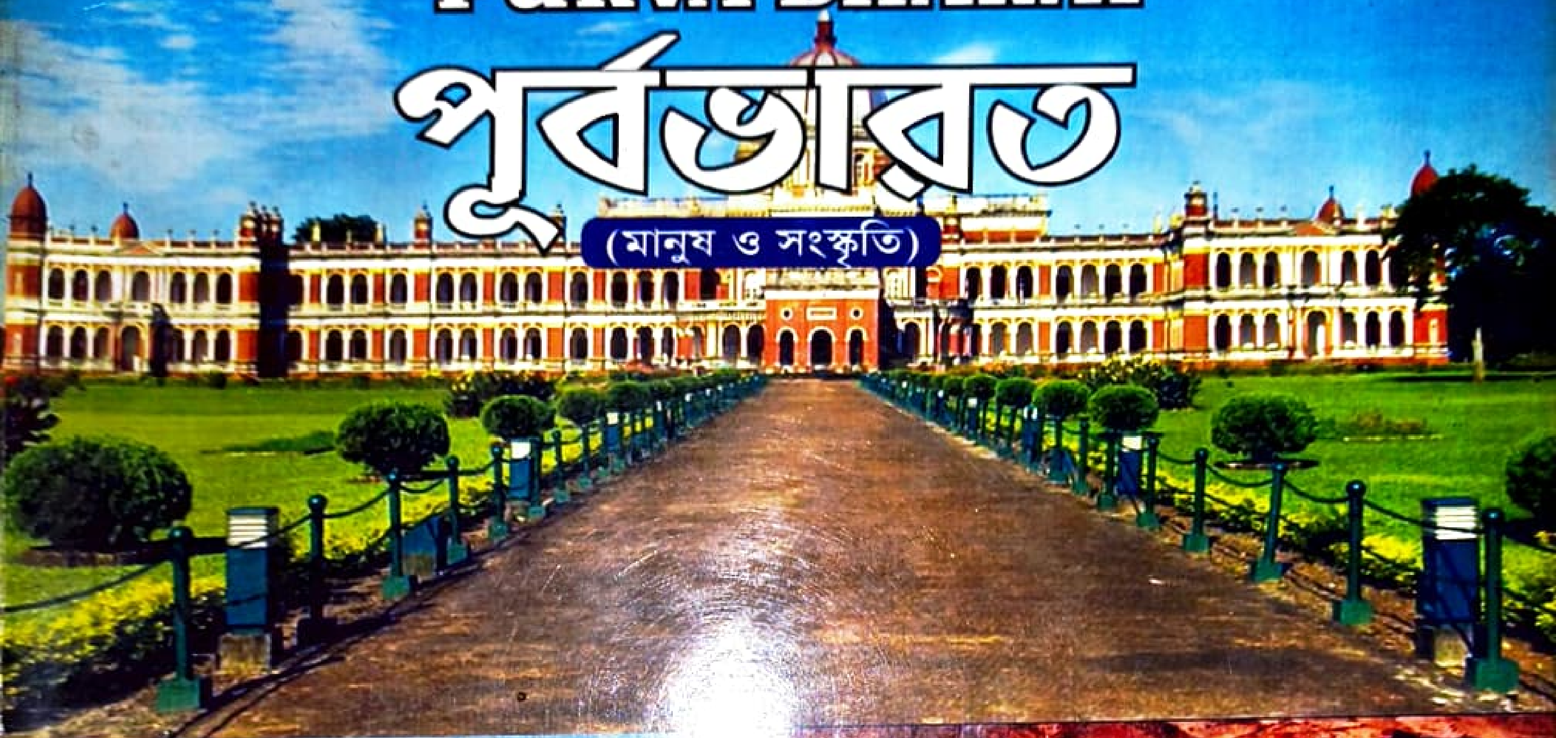

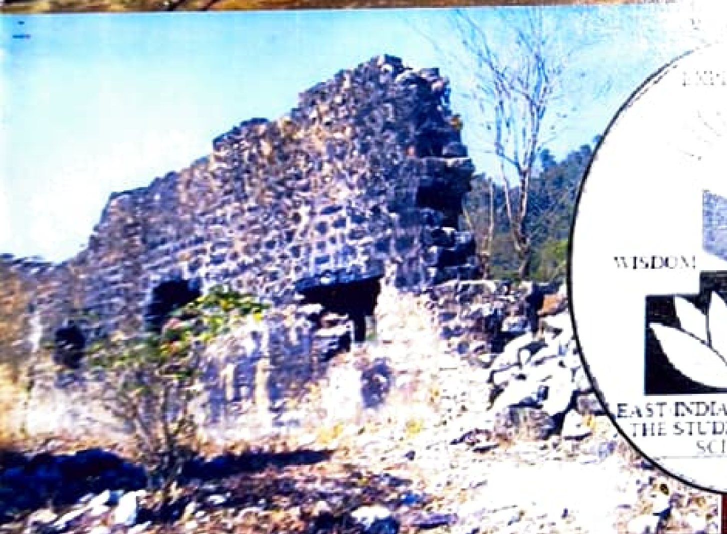

EXPLORATION

WISDOM HONESTY

EAST INDIAN SOCIETY FOR THE STUDIES OF SOCIAL SCIENCES

2011

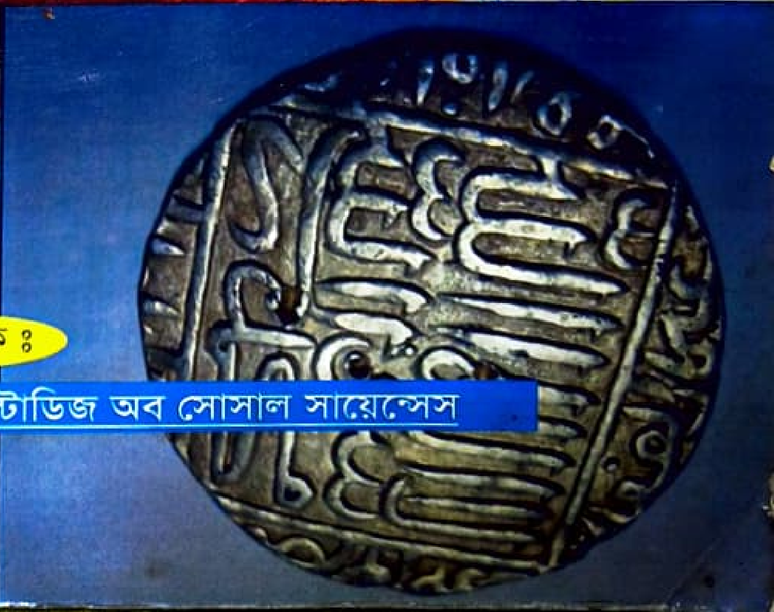

প্রকাশক ঃ
ইষ্ট ইন্ডিয়ান সোসাইটি ফর দ্যা স্টাডিজ অব সোসাল সায়েন্সেস

পূর্ব ভারত

(মানুষ ও সংস্কৃতি)

আই.এস.এস.এন ঃ- ২৩১৯-৮৫৯১
প্রথম বর্ষ, প্রথম খন্ড ঃ- প্রথম সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০১২

প্রকাশক

ইষ্ট ইন্ডিয়ান সোসাইটি ফর দ্যা স্টাডিজ অব সোসাল সায়েন্সেস

গভঃ রেজিঃ নং ঃ- S/1L/79269 (2011)

শোভাগঞ্জ, পোঃ- আলিপুরদুয়ার, জেলাঃ- জলপাইগুড়ি

সভাপতি	ঃ-	সুব্রত সরকার
সহঃ সভাপতি	ঃ-	পুষ্পজিৎ সরকার
সম্পাদক	ঃ-	সুজয় দেবনাথ
সহঃ সম্পাদক	ঃ-	জয়দীপ সিং
কোষাধক্ষ্য	ঃ-	জিতেন শীল

কার্যকরী সমিতির সদস্য

১. ডঃ অনিল চন্দ্র সরকার
২. ডঃ সুলেখা পন্ডিত
৩. ডঃ সিদ্ধার্থ শংকর লাহা
৪. অধ্যাপিকা জলি বিশ্বাস
৫. অধ্যাপক রাজিব ভৌমিক
৬. অধ্যাপক জয়দীপ রায়
৭. অধ্যাপক বিভূতিভূষণ বিশ্বাস
৮. অধ্যাপক অজয় কুমার দত্ত
৯. বিশ্বজিৎ দেব
১০. মনোময় সেন

যোগাযোগ

ইমেইল

eastindiansociety@yahoo.in

web :- w.w.w. eastindiansociety.org

ভূমিকা

পূর্ব ভারতের জীবন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি ও সংস্কৃতির দর্পণ 'পূর্বভারত' 'আই.এস.এস.এন.' নিয়ে প্রকাশিত হল চেতনানিষ্ঠ প্রয়াসের ফসল হয়ে, নতুন কথা ও ভাবনার ডালা সাজিয়ে। বাংলায় একটি গবেষণামূলক পত্রিকা প্রকাশ এবং তা সময়ানুবর্তীতার পরিধিতে সঞ্চরণশীল রাখার পরিকল্পনা ও আশা মননে লালিত হলেও বাস্তবায়িত করা সাধ্যের মধ্যে ছিল না দীর্ঘ দিন। আজ স্বপ্ন হাতের মুঠোতে এলেও এই অঞ্চলের গবেষকদের অনুসন্ধিৎসু কর্মনিষ্ঠা গতিময় না থাকলে, বাস্তব পুনরায় স্বপ্নায়িত হবে; ধুমায়িত হবে এই পত্রিকার ভবিষ্যত; আমরা সকলে যেন একথা মনে রাখি।

বর্তমান সংখ্যায় প্রবন্ধ আছে আঠারোটি। নিজের মতো করে লেখকদের প্রতিজন বিষয়ানুযায়ী তাঁর সেরাটা দেবার চেষ্টা করেছেন; লেখা গুলির ক্রটি-বিচ্যুতি ও সীমাবদ্ধতা সুধী পাঠকবর্গ অবশ্যই বিচার করবেন। পাঠকের মূল্যবান মতামত আমরা পরবর্তী সংখ্যার পরিশিষ্টে প্রকাশ করবো। এই সংখ্যায় কয়েকজন নবীন গবেষকের অবদান আছে যাদের লিখিত বিষয়বস্তুর মান কোন অংশে প্রবীণদের লেখা গুলির চেয়ে উনতর নয়। নতুন গবেষকদের উৎসাহিত করাও এই পত্রিকার একটি লক্ষ্য।

ডঃ অনিল কুমার সরকারের 'বাংলায় মতুয়া ধর্ম আন্দোলনের ইতিহাস ঃ ফিরে দেখা', নিঃসন্দেহে একটি অভিনব বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছে। উনিশ শতকের বাংলায় সমাজ সংস্কারক হরিচাঁদ এবং গুরুচাঁদ ঠাকুর নমশূদ্র সমাজে যে সাংস্কৃতিক জাগরণ ঘটিয়েছিলেন সে বিষয়ে চর্চা ও বিশ্লেষনের অভাব এধরনের লেখা নিঃসন্দেহে দূর করবে আশা করি; তবে এই আন্দোলন 'Sanskritization' ছিল কিনা তা অনুধাবনের অবকাশ থেকেই যায়। সুব্রত সরকার 'ভারতের ক্ষত্রিয় তথা যোদ্ধা জাতি ও ক্ষাত্রত্ব'- এই প্রবন্ধে হিন্দু বর্ণ-জাতি ব্যবস্থা ও বিভাজনের যৌক্তিকতা এবং ভারতের সমাজ ও ইতিহাসের বিবর্তনের গতিপথে এর মানবাধিকার পরিপন্থি ধারাবাহিকতা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন। প্রায় সমতুল্য যুক্তি দিয়ে অধ্যাপক বিভূতিভূষণ বিশ্বাস হিন্দু নারীর অসহায়তার কথা ও কাহিনী তুলে ধরেছেন তার 'প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে নারীর অবস্থান' প্রবন্ধে।

সুজয় দেবনাথ এর মননশীল প্রবন্ধ 'ভারতে উপনিবেশ বিরোধী জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম ও আদিবাসী সম্প্রদায় ঃ ইতিহাসের আদিকল্পের দুর্বলতা' আধুনিক ভারতে ইতিহাস চর্চা (Historiography) এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস সঙ্কলনে জাতীয়তাবাদী, মার্কসবাদী এবং নিম্নবর্গের ইতিহাস রচনাকারী ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিভঙ্গি (Philosophy of History) ও বিশ্লেষনের সীমাবদ্ধতা নিয়ে ব্যাখ্যা দিয়ে এক সার্বিক মানবতাবাদী মনোভাব নিয়ে ইতিহাস চর্চার কথা বলেছেন।

কোচবিহারের উপর সর্বমোট পাঁচটি লেখায় জানা-অজানা বিভিন্ন দিক নতুন বর্ণনা, ব্যাখ্যা ও তথ্যসংযোজনে বিশেষভাবে উঠে এসেছে ডঃ সীমান্ত চৌধুরী'র 'উপভাষাতত্ত্বের আলোকে কোচবিহারের ভাষা', অনুপ রঞ্জন দে'র 'কোচবিহারের স্থাপত্য বৈচিত্র ঃ সিদ্ধেশ্বরী মন্দির', বাপ্পা মহন্তের কোচবিহার রাজ্যে ইতিহাস চর্চার বিকাশ ঃ একটি ঐতিহাসিক পর্যবেক্ষণ', দেবাশীষ দে'র 'গোঁসানীমারি ঃ ইতিহাস ও জনশ্রুতি', কৌশিক চক্রবর্ত্তী'র 'মধুপুর ধাম এবং বৈকুণ্ঠপুর দামোদরদেবের ধাম ঃ কোচবিহার রাজ আমলে কামরূপী বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার ও প্রসার কাহিনী' এবং দেবজিৎ দত্তের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে প্রাচীন কোচবিহারে দাস ব্যবসা' প্রভৃতি প্রবন্ধে।

বাকি প্রবন্ধ গুলির কোনটি তথ্য আবার কোনটি তত্ত্বের বিচারে মনাকর্ষণী; এবং বিষয়ের নিরিখে সঙ্গিহীন ও অভিনব; অর্থাৎ ঐ বিষয়ে একটি করেই প্রবন্ধ আছে; এবং সেগুলি হলো- জয়দীপ সিং'র 'ধর্মীয় ভাবনার প্রেক্ষাপটে বোড়ো সমাজ', টুবাই সরকারের 'শিলিগুড়ির ক্রমবিকাশ (অতীত থেকে বর্তমান)', সুপম বিশ্বাসের উপনিবেশিক পর্বে বাঙালী চা-করদের জীবনযাত্রা ঃ প্রসঙ্গ উত্তরবঙ্গ', অখিল সরকারের 'ইতিহাসে এবং সংস্কৃতি চর্চায় নবদ্বীপের স্থান ও অবদান', মিঠুন দত্তের 'কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল কাব্য পাঠের প্রয়োজনীয়তা', প্রাণকুমার রজকের 'রূপবৈষম্য ঃ কালো মেয়ের কপাল মন্দ', এবং স্বনামধণ্য লেখক ও প্রাবন্ধিক ডঃ দিগ্বিজয় দে সরকারের 'স্কট পরিবার, লুসি স্কট ও রবীন্দ্রনাথ'।

মনে বেদনা রইল এই ভেবে যে পত্রিকার নাম 'পূর্ব-ভারত' হলেও বৃহত্তর উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উপর কোন প্রবন্ধ পাওয়া যায় নি। আগামী সংখ্যায় এই অভাবোত্তরণ সম্ভব হবে আশা করি।

সহ-সম্পাদক অধ্যাপক বিভূতিভূষণ বিশ্বাস এবং আমার ছাত্রপ্রতিম জয়দীপ, সুজয় ও সুব্রত সম্পাদনার দৌড়-ঝাপের মূল কাজগুলি করেছে; না হলে ঘরে বসে বাকি কাজ আমার পক্ষে সম্ভব হতো না। আমাদের সর্ববিধ ভাবনা ও প্রয়াসে শৈলেন দেবনাথের সহযোগিতা মনে থাকবে। লেখক ও পাঠকদের জন্য ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা রইল।

ডঃ সুলেখা পন্ডিত
আলিপুরদুয়ার
১৫ই ডিসেম্বর ২০১২

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
০১	বাংলায় মতুয়া ধর্ম আন্দোলনের ইতিহাস ঃ ফিরে দেখা ডঃ অনিল কুমার সরকার --------------------------	৯ – ১৮
০২	ভারতের ক্ষত্রিয় তথা যোদ্ধা জাতি ও ক্ষাত্রত্ব সুব্রত সরকার ------------------------------------	১৯ – ২২
০৩	ভারতের উপনিবেশ বিরোধী জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম ও আদিবাসী সম্প্রদায় ঃ ইতিহাসের আদিকল্পের দুর্বলতা, সুজয় দেবনাথ -------	২৩ – ৩৬
০৪	উপভাষাতত্ত্বের আলোকে কোচবিহারের ভাষা, ডঃ সীমান্ত চৌধুরী --	৩৭ – ৫০
০৫	ধর্মীয় ভাবনার প্রেক্ষাপটে বোড়ো সমাজ জয়দীপ সিং -------------------------------------	৫১ – ৫৫
০৬	শিলিগুড়ির ক্রমবিকাশ (অতীত থেকে বর্তমান) টুবাই সরকার ----------------------------------	৫৬ – ৬৬
০৭	কোচবিহারের স্থাপত্য বৈচিত্র ঃ সিদ্ধেশ্বরী মন্দির অনুপ রঞ্জন দে ----------------------------------	৬৭ – ৭১
০৮	উপনিবেশিক পর্বে বাঙালী চা করদের জীবনযাত্রা ঃ প্রসঙ্গ উত্তরবঙ্গ ----- সুপম বিশ্বাস ----------------------	৭২ – ৮২
০৯	কোচবিহার রাজ্যে ইতিহাস চর্চার বিকাশ ঃ একটি ঐতিহাসিক পর্যবেক্ষণ---- বাপ্পা মহন্ত -------------	৮৩ – ৮৮
১০	গোঁসানীমারি ঃ ইতিহাস ও জনশ্রুতি দেবাশীষ দে -------------------------------------	৮৯ – ৯৫
১১	মধুপুর ধাম এবং বৈকুণ্ঠপুর দামোদর দেবের ধাম ঃ কোচবিহার রাজ আমলে কামরূপী বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার ও প্রসার কাহিনী ------- কৌশিক চক্রবর্ত্তী -------------	৯৬ – ১০৩
১২	ইতিহাসে এবং সংস্কৃতি চর্চায় নবদ্বীপের স্থান ও অবদান অখিল সরকার ------------------------------------	১০৪ – ১০৮
১৩	কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল কাব্য পাঠের প্রয়োজনীয়তা মিঠুন দত্ত --------------------	১০৯ – ১১৭
১৪	রূপবৈষম্য ঃ কালো মেয়ের কপাল মন্দ প্রাণকুমার রজক ------------------------------	১১৮ – ১২১
১৫	প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে নারীর অবস্থান বিভূতিভূষণ বিশ্বাস ----------------------------	১২২ – ১২৬
১৬	ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে প্রাচীন কোচবিহারে দাস ব্যবসা দেবজিৎ দত্ত ------------------------------------	১২৭ – ১৩১
১৭	স্কট পরিবার, লুসি স্কট ও রবীন্দ্রনাথ ডঃ দিগ্বিজয় দে সরকার ------------------------	১৩২ – ১৩৪
১৮	জলপাইগুড়ি ঃ ইতিহাসের পথে- উপন্যাসের পাতায়, ডঃ সুলেখা পন্ডিত -----------------------------	১৩৫ – ১৩৮
১৯	লেখক পরিচিতি	১৩৯

বাংলায় মতুয়া ধর্ম আন্দোলনের ইতিহাস ঃ ফিরে দেখা

ডঃ অনিল কুমার সরকার

ভরা বুকে খোলা চুলে, জয় হরিচাঁদ বলে, দাঁড়া দেখি মতুয়া সন্তান, দমদম মারো ডঙ্কা, ছিঁড়ে ফেল সব শঙ্কা, মহাব্যোমে উড়ারে নিশান, ভাবনা আর করিসকি, বেঁচে থেকে মরিস কি? বড় হয়ে হলি হতমান, জাগো, জাগো, জাগো বীর, সোজা করে রাখো শির, যাক জান বেঁচে থাক মান।[১] বিশেষভাবে হরিচাঁদ কে নিয়ে উক্ত পঙ্কতি একটি সম্প্রদায়কে উজ্জিবিত করেছে এবং একে সম্বল করে এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখেছে। অর্থাৎ উনবিংশ শতকে বাংলার সমাজ-সংস্কৃতি, ধর্ম ও রাজনীতির ক্ষেত্রে মতুয়াধর্ম আন্দোলন একটি যুগান্তকারী ঘটনা সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বাংলার সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমিকায় এখানকার চির অবদমিত 'চন্ডাল' জাতির নেতারা নিজেদের অধিকার পুনরুদ্ধরের জন্য স্বপ্ন দেখতে থাকেন এবং ছিন্ন-ভিন্ন দরিদ্র এবং সমাজের নিচু এই জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার পথ খুঁজতে থাকেন। রিক্ত নিঃস্ব ও সর্বহারা বহু শতাব্দী ধরে লাঞ্ছিত পতিত জাতিকে জাগানো এবং তাদের মানবাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য উনবিংশ শতকের উষালগ্নে অর্থাৎ ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জের সফলাডাঙ্গা গ্রামে এক অন্ত্যজ কৃষক পরিবারে শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর জন্ম গ্রহণ করেন।[২] বাংলার এই সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমিকায় শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরের আর্বিভাব 'চন্ডাল' জাতি নিজেদের স্বজাতীয়দের ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষেত্রে আশার আলো দেখতে পেয়েছিলেন।

বাংলায় মতুয়া ধর্ম আন্দোলনের প্রেক্ষাপট আলোচনা করার আগে একটি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা দরকার। ভারতীয় সমাজ গড়নে জাতিভেদ প্রথা অনড় থাকার ফলে, এদেশের বিভিন্ন জাতির জীবন যাত্রা এক বিচিত্র পথে পরিচালিত হতে বাধ্য হয়েছে। শাস্ত্রের বিচিত্র শাসন কোন সমাজই উপেক্ষা করতে পারেনি। জাতিভেদ তথা বর্ণভেদ প্রথার নগ্নরূপের প্রকাশ আরো বেশী করে ফুটে ওঠে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে। নানা মত ও মতান্তরে জাতিভেদ বিষয়ে প্রশ্ন তোলে এদেশের নির্যাতিত অংশ। জাতিবিভাগ, শ্রেণী আর ক্ষমতার সম্পর্কের মধ্যে প্রাক্-ঔপনিবেশিক বাংলার সনাতন হিন্দু সমাজের যে ভারসাম্য ছিল, ইংরেজ ঔপনিবেশিক সরকার নতুন নতুন সুযোগ সুবিধা তৈরি করতে থাকলে তা ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়।[৩] এছাড়া ইংরেজ ঔপনিবেশিক কোম্পানীগুলির সাথে বিভিন্ন বণিক সম্প্রদায়ের বাণিজ্যিক যোগাযোগের ফলে এক নতুন সমীকরণ তৈরী হয় এবং আর্থিক দিক থেকে অবস্থার উন্নতি ঘটে। অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে সাথে সামাজিক গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছিল যদিও এফ. কনলন মনে করেন যে এর দ্বারা সামাজিক পরিবর্তনের নির্ভরযোগ্য ছবি আদৌ পাওয়া যায় না। তাহলে আমরা দেখব যে বিংশ শতাব্দীর গোড়াতেও এই সামাজিক গতিশীলতা ছিল অত্যন্ত সীমিত। সমাজের একেবারে নিচের তলা থেকে উঠে আসছে- এ ঘটনা ও দুর্লভ।[৪] তবে একথা বলা হয় যে আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার ফলে, যে কারণে সামাজিক সীমারেখাগুলি নতুনভাবে চিহ্নিত হয় এবং একই জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের আত্মচেতনা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।

এই সময় পূর্ববঙ্গে সংখ্যার দিক থেকে সব থেকে বেশী ছিল নমশূদ্র সম্প্রদায় এবং সমগ্র বঙ্গ প্রদেশে তাদের স্থান ছিল দ্বিতীয়। এরমধ্যে বাখরগঞ্জ, ফরিদপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ, যশোর আর খুলনা জেলাতে সবথেকে বেশী নমশূদ্র সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ বাস করত।[৫] ১৯০১ সালের জনগণনা অনুযায়ী সারা বঙ্গ প্রদেশে নমশূদ্র জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই বাস করত উপরে বর্ণিত নির্দিষ্ট অঞ্চলগুলিতে, তাই স্বাভাবিক ভাবেই এই অঞ্চলটিকে নমশূদ্র প্রধান অঞ্চল বলে চিহ্নিত করতে পারি। এই বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থান, যার প্রধান কারণ সম্ভবত ছিল তাদের ইতিহাস।[৬] বঙ্গ প্রদেশের এই বিপুল জনসংখ্যার মানুষগুলি বাঙালি হিন্দু জনবিন্যাসের যে ক্রমপর্যায় ছিল, সামাজিক মর্যাদার দিক থেকে তাদের অবস্থান ছিল সব থেকে নীচের দিকে। এরা একসময় 'চন্ডাল'

ভারতের ক্ষত্রিয় তথা যোদ্ধা জাতি ও ক্ষাত্রত্য

সুব্রত সরকার

বৈচিত্রময় ভারতবর্ষে বর্ণ ও জাতির বৈচিত্রের শেষ নাই। মানব সৃষ্টির পর তাহারা প্রথমে সামাজিক হইয়া ছিল কিনা যোদ্ধা হইয়াছিল তাহা লইয়া বিতর্ক থাকিতেই পারে, কিন্তু আমার তো মনে হয় নিজের আত্ম রক্ষার্থেই হউক আর ক্ষুধা নিবারণের কারনে জন্তু হত্যার্থেই হউক গাছের ডাল লইয়া যখন তাহাদের পিছু তাড়া করিয়া বেড়াইত [১] তখন তাহাদের যোদ্ধা জীবনের প্রাথমিক সূচনা বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এই বিশ্লেষণের পর্বটি প্রাগৈতিহাসিক যুগের বলিয়া তাহা কেবল ধারণা ছাড়া, বিজ্ঞান সম্মত বিশ্লেষনের অবকাশ বিন্দুমাত্র নাই। কিন্তু কি সকল বিবেচনা করিয়া আর্য সকল ক্ষত্রিয় বর্ণের [২] উদ্ভাবন করিয়াছেন তাহা এই সীমিত বিবেচনার সাধ্য নাই খুঁজিয়া বেড়ায়। বর্তমানে জ্যাঁ ফ্রাসোয়া জারিজ এবং রিচার্ড মিডৌ খুড়িয়া খুড়িয়া মাটির অতল গহ্বর হইতে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিলেন যে, ভারতের প্রাচীনতম সভ্যতা সিন্ধু বা হরপ্পা সভ্যতা নহে, তাহা ছিল মেহেরগড় সভ্যতা এবং ইহা কমবেশী প্রায় ৭০০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দ নাগাদ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ভারতে স্ব-মহিমায় বিচরণ করিত। [৩] কিন্তু তাহার অবশিষ্টাংশ হইতেও প্রাচীন ভারতীয় যোদ্ধা জাতির কোন অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। আবার হরপ্পা সভ্যতাতেও কোন উল্লেখযোগ্য মারণাস্ত্রের সন্ধান না পাওয়া যাওয়ায় নানা পন্ডিতবর্গ মতামত করিয়াছেন যে, যুদ্ধ বিদ্যা সম্বন্ধে তাহারা অতটা পারদর্শী ছিলেন না। তাহার কারণেই তো বহিরাগত যোদ্ধা আর্য জাতির হাতে তাহাদের নাস্তানাবুদ হইতে হইয়াছে আর মহেঞ্জোদারোতে একের পর এক মৃতদেহ বিনা বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াই শব দেহের ঢিবি রচনা করিয়াছে। [৪] অর্থাৎ মোট কথা হইল যোদ্ধা জাতি বা ক্ষাত্রত্ব বোধ তাহাদের ছিল না।

কিন্তু অল্প বিস্তর অনুসন্ধিৎস্যু মন ধোঁয়া দেখিলেই আগুন খুঁজিয়া বেড়ায়। হরপ্পা সভ্যতায় দূর্গের যে কম বেশী অস্তিত্ব ছিল তাহা এখন আর কাহারো অজানা নহে। সুতরাং দূর্গ নির্মাণের মূল কারণ তো আত্মরক্ষা, তবে আত্মরক্ষা কাহার হইতে, অবশ্যই শত্রুপক্ষীয় জন হইতে। তাহা হইলে দূর্গ অর্থাৎ আত্মরক্ষার স্থান থাকিবে কিন্তু তাহা মোকাবিলা করিতে যোদ্ধা বা অস্ত্রসস্ত্র থাকিবে না তাহা কি করিয়া মানিয়া লইব। উপযুক্ত পরিমাণে অস্ত্র পাওয়া যায় নাই বলিয়া যোদ্ধা জাতির অস্তি ত্বের অন্য সকল সম্ভাবনাকেও অস্বীকার করিতে হইবে।

আবার এর পরেই আমরা ক্ষত্রিয় সম্প্রদায় সম্বন্ধে বিস্তারিত এবং পাকাপোক্ত ধারণা বৈদিক যুগে পাইয়া থাকি। এই সময় উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ দিয়া আর্যরা ভারতে প্রবেশের সময়কালে তাহাদের মধ্যে স্পষ্টত তিনটি বর্ণের বিস্তর বিচরণ ছিল [৫]। এই বর্ণ ভেদে ব্রাহ্মণ এবং সাধারণ আর্যগণ ছাড়াও ক্ষত্রিয় (যোদ্ধা জাতি) নামাঙ্কিত একটি বিশেষ বর্ণের উৎপত্তি ঘটিয়া ছিল। সাধারণত ভারতবর্ষীয় ইতিহাসে এই সময়কাল হইতেই আমরা ক্ষত্রিয় জাতি ও ক্ষাত্রত্ব সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট ধারণা পাইয়া থাকি [৬]। পরবর্তী সময়ে বর্ণ ভেদ জাতিভেদে পরিণত হইলে এবং কোন বর্ণের মধ্যে অন্যবর্ণের জনসাধারনের প্রবেশ বা বিচরণের অধিকার না থাকিলে ব্রাহ্মণগণ প্রাধাণ্যতার সর্বশীর্ষ পদটি এবং তৎসহ ক্ষত্রিয়গণ দ্বিতীয় পদখানি আক্রাইয়া ধরিয়া থাকে। এই খানে এই দুইটি পদের সমাজে বেশ রমরমা বিচরণ চলিত। কিন্তু সভ্যতার চাকা ঘুরাইবার অধিকারী হইয়াও বৈশ্য এবং শূদ্ররা ভদ্রাসন তো দুরস্ত, একেবারে তলানিতেই রহিয়া গেল। উচ্চ দুই বর্ণ ব্রাহ্মণ এবং ধর্মীয় মারপ্যাচ আর ক্ষত্রিয়ের শাসন ও রাজস্ব আদায়ের ফলে নিচের দুই বর্ণের অবস্থা একেবারে নিষ্পেষিত হইতে লাগিল [৭]। আর এই নিষ্পেষনে প্রাণ শুধুমাত্র ওষ্ঠাগত হইয়াই যে ক্ষান্ত থাকিবে তাহার সাধ্য কি ; বরং সেই প্রাণ যেন পটাপট নিষ্ক্রান্ত হইয়াই হাঁফ ছাড়িত।

এই পর্বে ক্ষত্রিয়, ক্ষাত্রত্ব, যুদ্ধ ও যোদ্ধা লইয়া একটু বিশেষ আলোচনার প্রয়োজন রহিয়াছে। ক্ষত্রিয় বলিতে কি বোঝায় ? সংক্ষিপ্ত উত্তর, যাহারা যুদ্ধ করে, দেশ রক্ষা করে, শাসন আর নানা কার্যে নানা বীরত্ব দেখায়। এই সকল বীরত্বের মধ্যে আবার কঠোর হৃদয় রাজস্ব আদায়ে

ভারতে উপনিবেশ বিরোধী জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম ও আদিবাসী সম্প্রদায় ঃ ইতিহাসের আদিকল্পের দুর্বলতা

সুজয় দেবনাথ

ঔপনিবেশিক শাসনপর্বে শারীরিক ও সামাজিক নৃ-তত্ত্বের (Physical and Social Anthropology) নিরীখে ভারতীয় মানব গোষ্ঠীকে নতুন করে বর্গীকরণের জন্য 'আদিবাসী' (Aborigines) বা 'উপজাতি' (Tribe) শব্দটির ব্যাবহার শুরু হয়। স্বাধীন ভারতেও নামকরণের এই পদ্ধতি নতুন অলঙ্করণে পুরনো ধারাতেই বিরাজমান আছে। তবে নামকরণ ও বর্গীকরণের উৎসমুখ কিংবা প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে প্রচলিত জটিল বৌদ্ধিক বিতর্কে প্রবেশ করা আলোচ্য প্রবন্ধের অভীষ্ট লক্ষ্য নয়। ভারতের উপনিবেশ বিরোধী জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রান্তিয় স্তরের মানুষগুলির অবদানকে নতুন আঙ্গিকে ব্যাখ্যা করাই কাঙ্খিত উদ্দেশ্য। একথা অনস্বীকার্য যে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের কারণ, বিস্তার ও স্বরূপ নিয়ে বিস্তর আলোচনা হলেও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ভূমিকা যথোপযুক্ত ভাবে বর্ণিত হয় নি। প্রকৃতপক্ষে জাতীয়বাদী আন্দোলনের ইতিহাস নিয়ে প্রচলিত আদিকল্পের ত্রুটির জন্যই প্রকটিত হয়েছে এই দৈন্যতা। ব্রিটিশ শাসনের সূচনা লগ্নেই যারা গণসংগ্রামের বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন তাদের আত্মত্যাগ, সংগ্রাম, সাংগঠনিক কুশলতা প্রচারের আড়ালে কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। এই শূন্যস্থানের বিষয়ে আলোকপাত করার জন্য আলোচ্য প্রবন্ধে জাতীয় রাজনীতিতে গান্ধিজীর আবির্ভাবের কালকে বিভাজীকা হিসাবে ধরে নিয়ে আদিবাসী গণসংগ্রামের কাহিনী তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এই বিভাজন রেখা সুস্পষ্ট না হলেও গান্ধী পূর্বযুগের আদিবাসী বিদ্রোহগুলি মূলত পরিচালিত হয়েছে তাদের নিজস্ব উদ্যোগে। অপরদিকে গান্ধিযুগে জাতীয় কংগ্রেস পরিচালিত আন্দোলনে তারা সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহন করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, প্রবন্ধের পরিধীকে দীর্ঘায়ীত না করার জন্য গান্ধিপূর্ব যুগে সংগঠিত অসংখ্য আদিবাসী বিদ্রোহ বা গণসংগ্রামের বিস্তৃত বিবরণ না দিয়ে বিষয়গত বিশ্লেষণের জন্য প্রাসঙ্গিক অংশগুলিকে উদাহরণ হিসাবে যুক্ত করা হয়েছে। সমগ্র বিষয়বস্তুকে চারটি পর্বে বিভক্ত করে আলোচনা করা হয়েছে যথা—(১) ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিষয়ে প্রচলিত ইতিহাস চর্চার চার ঘরানার ত্রুটি, (২) গান্ধিপূর্ব যুগের আদিবাসী সংগ্রামের স্বরূপ বিশ্লেষণ, (৩) জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর একাংশের দূরত্বের কারণ বিশ্লেষণ ও (৪) গান্ধিযুগে বৃহত্তর জাতীয় সংগ্রামে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহন। প্রবন্ধের বিষয় উপস্থাপন প্রসঙ্গে বুর্জোয়া, উচ্চবর্গ-নিম্নবর্গ অথবা শিরোমনি কেন্দ্রিকতার (elitism) বদলে মডেল হিসাবে "মানুষের ইতিহাস" (History of men) এই দৃষ্টিভঙ্গীকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাই গান্ধিপূর্ব যুগের অদিবাসী বিদ্রোহ গুলিকে আকস্মিক, বিচ্ছিন্ন ক্ষণস্থায়ী হিসাবে প্রতিপন্ন না করে সেগুলিকে উপনিবেশ বিরোধী বিক্ষোভ হিসাবে বর্ণনা করাই যুক্তিসঙ্গত মনে হয়েছে।

(১)

ভারতের জাতীয়তাবাদী ইতিহাস চর্চাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন প্রতিরূপের (Model) ব্যাবহারে মূলত চারটি গোষ্ঠীর আবির্ভাব হয়েছে যথা- সাম্রাজ্যবাদী বা কেম্ব্রিজ ঘরাণা; (Imperialist Historiography) জাতীয়বাদী ঘরাণা, (Nationalist Historiography) মার্কসবাদী ঘরাণা (Marxist Hostoriography) এবং সাম্প্রতিক কালের নিম্নবর্গের ইতিহাস ঘরাণা (Sub-Altern Historiography) এই চার গোষ্ঠীর বেশীরভাগ ঐতিহাসিক তাদের ইতিহাস চর্চার অবয়ব নির্ধারনে ইউরোপীয় ইতিহাস চর্চার আদিকল্পকে প্রত্যাক্ষ বা পরোক্ষভাবে অনুসরন করেছেন। তবে এই চার ঘরাণার সাম্প্রতিক কালের অনেক ঐতিহাসিক পুরনো রক্ষণশীলতার বাধা অতিক্রম করে

উপভাষাতত্ত্বের আলোকে কোচবিহারের ভাষা

ডঃ সীমান্ত চৌধুরী

পশ্চিমবঙ্গের প্রান্তিক জেলা কোচবিহার। এই জেলার ভাষা বিষয়ে আলোকপাত করবার উদ্দেশ্যে এই প্রবন্ধের অবতারণা। ভাষা একটি জীবন্ত জিনিস এবং মানব সভ্যতার শ্রেষ্ঠতম আবিষ্কার, এই কারণে এই বিষয়ে মানুষের আবেগ অত্যন্ত গভীরভাবে জড়িত থাকে। মাতৃভাষার প্রতি এই আবেগ যেমন মানুষকে প্রেরিত করে ভাষার বিষয়ে জানবার জন্য, তেমনই এই আবেগের কারণে খুব সহজে মানুষকে ভাষা বিষয়ে উত্তেজিতও করে তোলা যায়। এই জন্যেই কোন অঞ্চলের ভাষা বিষয়ের আলোচনায় অগ্রসর হলে নিরপেক্ষতার অভাব দেখা দেওয়া আশ্চর্য নয়, বিশেষ করে সেই আলোচক যদি সেই ভাষা-অঞ্চলেরই অধিবাসী হন। আমি এই কোচবিহারেই জন্মেছি তাই এই জন্মস্থানের ভাষা বিষয়ে আমি আলোকপাত করবার চেষ্টা করছি। এই বিষয়ের পন্ডিতদের উদ্দেশ্যে আমার রচনা নয়, কারণ এ বিষয়ে তাঁরা আমার থেকে অনেক বেশি জানেন, তাই আমি এই অঞ্চলের ভাষা আলোচনার পূর্বে, ভাষা- উপভাষা প্রভৃতি বিষয়ে সামান্য ধারণা দেবার প্রয়াস করেছি। পশ্চিমবঙ্গের উত্তর অংশে ২৫ ডিগ্রি ৫৭ মিনিট ৪৭ সেকেন্ড থেকে ২৬ ডিগ্রি ৩৬ মিনিট ২ সেকেন্ড উত্তর অক্ষাংশ ও ৮৯ ডিগ্রি ৫৪ মিনিট ৩৫ সেকেন্ড থেকে ৮৮ ডিগ্রি ৪৭ মিনিট ৪৪ সেকেন্ড পূর্ব দ্রাঘিমার মধ্যে কোচবিহার জেলা অবস্থিত- একথা বললে আমি কোচবিহারের অবস্থান সম্পর্কে কিছুই ধারণা করতে পারিনা, কিন্তু না বুঝলেও স্বীকার করি এই ভাবে অবস্থান নির্দেশ করাই সবচাইতে বৈজ্ঞানিক পন্থা। তেমনই 'বইয়ের ভাষা', 'কলকাতার ভাষা', 'রকবাজদের ভাষা, 'বঙ্কিমের ভাষা' এই সব শব্দবন্ধে 'ভাষা' শব্দটির মধ্যে অর্থ ও মাত্রাগত কি তফাৎ আছে তা সাধারণ মানুষের কাছে অজ্ঞাত থাকতেই পারে। তেমনই ভাষা-উপভাষা বিষয়েও যে সকলের সমান ধারণা থাকবে, তা আশা না করাই ভালো। এই একটি কারণেই এই প্রবন্ধে ভাষা ও উপভাষা বিষয়ে সাধারণ ধারণা দেবার প্রয়াস করেছি, যাতে এইসব বিষয়ে অস্পষ্টতা না থাকে।

প্রকৃতপক্ষে কোচবিহারের ভাষা বলতে আমি এই অঞ্চলের প্রাচীন জনগোষ্ঠীর ভাষাকেই বোঝাতে চাইছি, যে ভাষায় এই জেলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ কথা বলে। আমি প্রথমেই ধরে নিচ্ছিনা কোচবিহারের বাচিকগোষ্ঠী কোনও উপভাষার অন্তর্গত, কিন্তু তবুও উপভাষা বিষয়ক আলোচনা অনিবার্য, কারণ বহু ভাষাবিদ, কোচবিহারের ভাষাকে 'কামরূপী উপভাষা' বলে চিহ্নিত করেছেন। ভাষাতাত্ত্বিকদের মতকে অগ্রাহ্য করার মত এখনও তেমন বলিষ্ঠ যুক্তি খুঁজে পাইনি। তবে উপভাষা সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে প্রথমে ভাষা সম্পর্কে আলোচনা প্রয়োজন। কারণ ভাষা আর উপভাষা ঘনিষ্ঠ আবদ্ধ।

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ' গ্রন্থে ভাষার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে লেখেন- "মনের ভাব-প্রকাশের জন্য, বাগ্-যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনির দ্বারা নিষ্পন্ন, কোনও বিশেষ জন-সমাজে ব্যবহৃত, স্বতন্ত্র-ভাবে অবস্থিত, তথা বাক্যে প্রযুক্ত, শব্দ-সমষ্টিকে ভাষা বলে।" [১]

তিনি এরপরই বিষয়টিকে বিস্তৃত ব্যাখ্যা করে বলেন যে, মানুষের মুখের ভাষাই মুখ্যত ভাষা। "ইঙ্গিত, স্পর্শ, মূক ও বধিরের হস্ত-সঙ্কেত, বংশী-ধ্বনি বা অন্য বাদ্য ধ্বনির দ্বারা বিশেষ কোনও আজ্ঞা- বা সংবাদ জ্ঞাপন, বিশেষ কোনও রঙ্গের দ্বারা ভাব-প্রকাশ-অল্প-বিস্তর-ভাবে ভাব-দ্যোতনায় সহায়ক হইলেও, যথার্থ- রূপে এগুলি "ভাষা"- পদ-বাচ্য নহে।" [২]

এই ব্যাখ্যায় পরিষ্কার যে, মানুষের বাগ্যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত হলে তবেই তা ভাষা পদবাচ্য হবে, মানুষের মুখ নিঃসৃত ধ্বনি না হলে তা ভাষা বলে গণ্য হবে না।

ধর্মীয় ভাবনার প্রেক্ষাপটে বড়ো সমাজ

জয়দীপ সিং

"দেশের লোক-সংস্কৃতির মধ্যে অতীত যুগের সংস্কৃতির এমন বহু নিদর্শনাদি সংগুপ্ত আছে যেগুলি আমাদের জাতির পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার মূল্যবান উপকরণ হতে পারে।"

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মানব সভ্যতার ইতিহাস বিশ্লেষন আধুনিক গবেষণা তথা গবেষকদের এক আলোচিত ক্ষেত্র। সভ্যতার বিবর্তন, মানব সমাজের ক্রমবিকাশ তথা মানব জীবনের বৈচিত্র্যগত বৈশিষ্টগুলি আজ আলোচনার প্রধান বিষয়বস্তু। এই মানব জীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত আছে তার লৌকিক তথা পারলৌকিক বিশ্বাস গাথা ও নানান উপকথা। ধর্ম ও তার বিকাশ মানব সমাজের এক বিশাল অংশজুড়ে অবস্থান করছে। ধর্ম ছাড়া মানুষের পুরোপুরি অস্তিত্বকে যেন আংশিক অস্বীকার করা। তাই ধর্ম বিষয়ক আলোচনা, তথ্যমূলক গবেষনা প্রকৃতপক্ষে মানব সভ্যতার বিকাশের ইতিহাসকে প্রতিফলিত করে। আদিম সমাজ তথা মানব সভ্যতার নানান স্তরে, যুগ পরিবর্তনের সময় কালে ধর্মের স্বরূপ হয়তো সমান ভাবে পরিলক্ষিত হয় নি। কারণ ধর্মীয় ভাবনার ব্যাখ্যা নানান সময়ে নানা ভাবে আলোচিত। এই আলোচনা কখনই এককেন্দ্রিক নয় বা সম অভিমুখী নয়।

ধর্মীয় ভাবনা একটি জাতির আদিকালের বহমান ধারাকে নিজ আঙ্গিকে এবং নিজ উদ্যোগে এগিয়ে নিয়ে যায় এক শাশ্বত প্রকাশের মাধ্যমে। মানব ইতিহাসের এক বৃহৎ অধ্যায় ধরে আছে তার ধর্ম ভাবনা। একটি জাতির ইতিহাস তার ধর্মীয় প্রকাশের মাধ্যমে অনেকাংশে প্রতিফলিত হয়। তাই যে কোন জনজাতির আলোচনায় ধর্ম ও তার ভাবনার প্রকাশ স্বভাবতই গুরুত্বের অধিকারী। আধুনিক সভ্যতার মায়াজালে আজ হয়তো অনেক জনজাতি তার পরিপূর্ণ ধর্মীয় ভাবনাকে অক্ষুন্ন রাখার লড়াইতে সামিল হয়েছে এবং বলা খুবই দূরহ যে সেই লড়াইতে নামার মানসিকতাও ক্রমশ অস্তমিত হচ্ছে। তাই সামাজিক চালচিত্রের এই পর্যায়ে আজ আমরা আরও বেশি করে অগ্রসর হচ্ছি পুরাতন সংস্কৃতির রূপ ও ভাবনাকে সংরক্ষনের প্রয়াসে। এই প্রাসঙ্গিকতার পরিপ্রেক্ষিতেই আলোচনার বিষয়বস্তু ধর্মীয় ভাবনার প্রেক্ষাপটে বড়ো সমাজ।

উত্তর ও উত্তর পূর্ব ভারতের বিশাল ভূ-ভাগের শান্ত ও স্নিগ্ধ এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অতীব মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে মেচ বা বড়োদের বসবাস। প্রাচীন ইতিহাস গবেষক ও প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে মেচ বা বড়োগন 'ইন্দো-মঙ্গোলীয় বড়্' জাতির বংশধর। এই 'বড়্' জাতির নামানুসারেই বর্তমান বড়্ > বড্ড > বডো > বড়ো জাতির উৎপত্তি। এই বড়োগন নানা ভাবে নানান জায়গায় ছড়িয়ে পড়ায় সেখানকার ভৌগলিক ও পরিবেশগত কারণে নানান উপনামেও পরিচিত হয়েছে, যেমন- নেপালের ও সংলগ্ন উপত্যকাবাসী বড়োগন মেচী নদীর নামানুসারে 'মেচ' বা 'মেচে'। সঙ্কোশ নদী থেকে পূর্বে ব্রহ্মপুত্র বা বরাক উপত্যকাবাসীগণ বড়ো, কাছাড় ও পর্বতবাসীগণ বডো-কাছারী, ডিমাপুর-বাসীগন 'ডিমসাবডো', ত্রিপুরাবাসীগন কোক্ বড়ো, মনিপুরবাসীগণ 'মনিপুরীবড়ো' ইত্যাদি নামে পরিচিত। বড়ো জাতি আসাম, উত্তরবঙ্গ, নাগাল্যান্ড, মনিপুর, ত্রিপুরা, মেঘালয়, অরুনাচল প্রদেশ এবং মিজোরামের কিছু এলাকা সহ পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র বাংলাদেশ ও নেপালেও বসবাস করে থাকে। বি এইচ হাডসন বোড়ো শব্দটিকে জাতিগত ভাষা শব্দ বোঝাতে প্রথম ব্যবহার করনে। পরবর্তীকালে এই বোড়ো শব্দটিকে জাতি ও ভাষা বোঝাতে ব্যবহার করা হয়।[১]

মেচ বা বড়োদের এক সময় প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশে লড়াই করে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে হয়েছে। সেহেতু আদিকাল থেকেই বড়োদের সাথে প্রাকৃতিক পরিবেশের এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বর্তমান। ফলে প্রাকৃতিক কারণেই মেচ বা বড়োদের ধর্মজীবন সৎ-সরল ও শৃঙ্খলাপরায়ন। বড়ো সম্প্রদায়ের মানুষেরা মূলত প্রকৃতির উপাসক। প্রকৃতি বিশ্বাসী বড়োদের

শিলিগুড়ির ক্রমঃ বিকাশ (অতীত থেকে বর্তমান)

টুবাই সরকার

উত্তরবঙ্গের বাণিজ্যিক রাজধানী এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার হল শিলিগুড়ি। ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের দার্জিলিং জেলায় অবস্থিত শিলিগুড়ি শহর। এই শহরটি ২৬°৭১' উত্তর এবং ৮৮°৪৩' পূর্ব দ্রাঘিমা রেখায় অবস্থিত। হিমালয় পর্বতের পাদদেশের সমতল ভূমি এবং মহানন্দা নদীর তীরে গড়ে উঠেছে এই নবীন শহর শিলিগুড়ি। এর উত্তরে সিকিম, পশ্চিমে নেপাল, পূর্বে নিউজলপাইগুড়ি ও দক্ষিণে বাংলাদেশ। সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ৪০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত এবং শিলিগুড়ি পুর কর্পোরেশনের অধীন ৪১.৯ বর্গ কিলোমিটার অঞ্চল রয়েছে এই শহরের।

নামের উৎস ঃ

শিলিগুড়ির প্রাচীনত্ব রহস্যে আবৃত্ত, ডঃ শৈলেন দেবনাথের মতে, শিলিগুড়ি মানে নুড়ি পাথরের একটি ঢিপি এবং উনবিংশ শতকেও এই অঞ্চলটিকে বলা হত 'শিলিচাগুড়ি'। 'শিলা' থেকে 'শিলিগুড়ি' নাম হয়েছে। পাহাড়ে প্রচন্ড বৃষ্টিপাতের ফলে আলগা বড়ো পাথর গুলি মহানন্দা নদীতে খরস্রোতে গড়িয়ে পড়ত। আরেকটি মত হল- এই অঞ্চলে গভীর শাল বৃক্ষের বনভূমি ছিল। শহরের অর্থনৈতিক আধিপত্য এই বৃক্ষের উপর নির্ভরশীল ছিল। তাই 'শাল' গাছ থেকে নাম হয়েছে 'শিলিগুড়ি'।[১]

আবহাওয়া ঃ

এই অঞ্চলে তিনটি প্রধান ঋতু রয়েছে গ্রীষ্মকাল, শীতকাল এবং বর্ষাকাল। গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা ৩৪° সেলসিয়াসের উপরে উঠে যায়। শীতকালে প্রচন্ড ঠান্ডা পড়ে। প্রায় ২° সেলসিয়াস থেকে ৩° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় চলে যায়। জুন-জুলাই থেকে আগষ্ট মাসে অবিরাম বৃষ্টিপাতের ফলে পার্শ্ববর্তী অঞ্চল জলমগ্ন হয়ে পড়ে। সম্প্রতি এই শহরে নগরায়ন, জনসংখ্যাবৃদ্ধি এবং নির্বিচারে বনসম্পদ ধ্বংসের ফলে উষ্ণতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভূমিকম্পপ্রবন অঞ্চলে অবস্থানের দরুন ১৯৮৮ সালের ৭ই জুলাই ব্যাপক ভূমিকম্প হয়েছিল। রিকটার স্কেলে মান ছিল ৯.৭। পুনরায় ২০১১ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর ভূমিকম্প হয়। রিকটার স্কেলে এর তীব্রতা ছিল ৬।

ব্রিটিশদের শিলিগুড়ি অধিগ্রহণ ঃ-

বর্তমান শিলিগুড়ির বিলুপ্ত বৈকুণ্ঠপুর বনাঞ্চলে কোচ বংশের শিষ্য সিংহ বা শিব সিংহ রাজধানী স্থাপন করে ছিলেন এবং স্থানের নাম দেন বৈকুণ্ঠপুর। লেখক বকুল চন্দ্র দের মতে, "শক্তিগড় শিলিগুড়ি কর্পোরেশনের অন্তর্গত এবং আইনগত ভাবে জলপাইগুড়ি জেলার অধীন হলেও এখনো এই অঞ্চলকে অনেকে পুরানো শিলিগুড়ি বলে থাকে। আসলে শিলিগুড়ি নামে প্রথম পরিচিত ছিল নৌকা ঘাটের বিপরীত স্থানটি যা বর্তমানে সুকান্ত পল্লী নামে পরিচিত।"[২]

এখন যেখানে হাস খাওয়া চা বাগান অবস্থিত সেখান থেকে ব্রিটিশদের অধিকাংশ সরকারি কাজকর্ম পরিচালিত হত। ডঃ শৈলেন দেবনাথ এর মতে ফাঁসি দেওয়ায় একটি বন্দর ছিল, এর মাধ্যমে মালদা, বাংলা, বিহার ও অন্যান্য অঞ্চলের সাথে বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। সিকিমের অধিবাসী এবং ভূটানিরা (কালিম্পঙ হয়ে আসত, যেহেতু অষ্টাদশ শতকের শুরু থেকে ১৮৬৫ খ্রীঃ পর্যন্ত ভূটানের অধীনে ছিল কালিম্পঙ) শিলিগুড়ির নিকটবর্তী মহানন্দা নদীর তীর ধরে বাণিজ্যের জন্য ফাঁসি দেওয়া বন্দরে যেত।[২ক] ১৮৪২ খ্রীঃ ২০০০ টাকার বিনিময়ে ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি অঞ্চল ভূটান সরকারের কাছ থেকে নিয়ে নেয়। তবে ১৮৬০ খ্রীঃ পর্যন্ত

কোচ্‌বিহারের স্থাপত্য বৈচিত্র ঃ সিদ্ধেশ্বরী মন্দির

অনুপ রঞ্জন দে

প্রাক্‌-স্বাধীনতা পর্বের ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষের অন্যতম দেশীয় রাজ্য হল কোচ্‌বিহার, যা ১৯৫০ সালের ১লা জানুয়ারি কোচ্‌বিহার জেলা রূপে ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই কোচ্‌বিহারে তৎকালীন রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অতি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হল প্রাচীন পুরাকীর্তি ও স্থাপত্যবৈচিত্র। বস্তুত, প্রাচীন মন্দিরগুলিই বর্তমানে কোচ্‌বিহারের পুরাকীর্তি ও স্থাপত্যের গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ বহন করে চলেছে। কোচ্‌বিহার জেলার যে সমস্ত প্রাচীন মন্দির স্থাপত্য বৈচিত্রের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন স্বরূপ সেগুলি নিম্নরূপ—

মন্দির	স্থান	বিগ্রহ
১। মদন মোহন ঠাকুরবাড়ি	কোচ্‌বিহার সদর	মদন মোহন, জয়তাঁরা কালী ভবানী
২। গুঞ্জবাড়ি মন্দির	কোচ্‌বিহার সদর	ডাংধরি মাও (দুর্গা)
৩। রাজমাতা মন্দির	কোচ্‌বিহার সদর	রাধাবিনোদ (দুর্গা)
৪। হিরণ্যগর্ভ শিব মন্দির	সাগরদিঘী (পশ্চিমপাড়)	শিবলিঙ্গ
৫। অনাথনাথ শিব মন্দির	সুভাষপল্লী, কোচ্‌বিহার	শিবলিঙ্গ, কালী, গণেশ, দুর্গা
৬। বড়দেবী মন্দির	কোচ্‌বিহার	দুর্গা
৭। হরিপুর শিব মন্দির	মধুপুর ধাম	শিবলিঙ্গ
৮। সিদ্ধনাথ শিব মন্দির	ধলুয়াবাড়ি	শিবলিঙ্গ
৯। বামাকালী মন্দির	গোঁসাইগঞ্জ	কালিকা
১০। ব্রাহ্মসমাজ মন্দির	কোচ্‌বিহার	
১১। গিরিধারীলাল গোপীবল্লভ মন্দির	তুফানগঞ্জ	শ্রীকৃষ্ণ, রাধা
১২। ষন্ডেশ্বর শিব মন্দির	তুফানগঞ্জ	শিবলিঙ্গ
১৩। সিদ্ধেশ্বরী মন্দির	বানেশ্বর	সিদ্ধেশ্বরী (দুর্গা), শিবলিঙ্গ, কামাখ্যা
১৪। দামেশ্বর শিব মন্দির	বারোকোদালী	শিবলিঙ্গ
১৫। চন্ডী ঠাকুরাণী মন্দির	কোচ্‌বিহার	চন্ডী
১৬। মদন মোহন মন্দির	দিনহাটা	শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম
১৭। কামতেশ্বরী মন্দির	গোসানীমারি	কামতেশ্বরী (দুর্গা)
১৮। শ্যামসুন্দর মন্দির	মেখলীগঞ্জ	শ্রীকৃষ্ণ
১৯। কোচ্‌বিহার কালীবাড়ি	বারাণসী	কালিকা, রাধাগোবিন্দ, শিব
২০। কোচ্‌বিহার বৃন্দাবন কুঞ্জ	বৃন্দাবন	বিষ্ণু
২১। বানেশ্বর শিব মন্দির	বানেশ্বর	শিবলিঙ্গ। [১]

কোচ্‌বিহার জেলার অধিকাংশ মন্দির নির্মিত হয়েছিল পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে এবং সে সময় মন্দির নির্মাণের প্রধান উপকরণ ছিল বাঁশ, খড়, মাটি ও টিনের চালা। ষোড়শ শতাব্দীর পর এই নির্মাণরীতিতে পরিবর্তন আসে এবং ইঁটের প্রচলন শুরু হয় বলে অনুমান করা হয়। [২] উক্ত মন্দিরগুলির গঠনশৈলীতে হিন্দু-মুসলিম স্থাপত্যশিল্পের সমন্বয় লক্ষ করা যায়। কারণস্বরূপ বলা যায় যে, বাংলা চারচালা মন্দিরের হিন্দু নির্মানরীতির সাথে যুক্ত হয়েছে মন্দিরের উপরিভাগে গম্বুজের ব্যবহার এবং মন্দিরের দেওয়ালে বিভিন্ন জ্যামিতিক অলংকরণ, যা সপ্তদশ শতাব্দীর মুসলিম স্থাপত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসাবে পরিলক্ষিত হয়। তবে, মন্দিরগুলিতে গম্বুজের উপরিভাগে হিন্দু

উপনিবেশিক পর্বে বাঙালী চা করদের জীবনযাত্রা ঃ প্রসঙ্গ উত্তরবঙ্গ

সুপম বিশ্বাস

উনিশ শতকের বাংলার ইতিহাস একাধারে বাঙালীর মহাকলঙ্ক ও মহাগৌরবের ইতিহাস, একদিকে আত্মবিস্মৃতির মোহনিদ্রা, অন্যদিকে আত্মপ্রতিষ্ঠার আলোকময় জাগরন। ইংরেজী সভ্যতার তীব্র বিদ্যুতের ছটায় অন্ধ "ইয়ং বেঙ্গল" দিশাহারা। বাংলার এ অভূতপূর্ব নবজাগরনের যুগে ধর্ম, সমাজ-সংস্কার, সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, শিল্প, রাজনৈতিক আন্দোলন — জাতীয় জীবনের প্রতি ক্ষেত্রেই মহাদিক্‌পালের অভ্যুদয় হলো। কিন্তু বাঙালী সাধনার এ সর্বাঙ্গীন উৎকর্ষের রূপ একটি বিশেষ দিকে প্রতিফলিত হলো না। যে কৃষি-শিল্প-বানিজ্যের ওপর জাতির আশা, আনন্দ, সাহিত্য-শিল্পকলা, এককথায় জাতির জাতিত্ব নির্ভর করে সে দিকটিই উপেক্ষিত রয়ে গেলো। ব্যবসায়ী বাঙালীর বিস্তার ঘটেনি। সরকারী চাকুরেরা হলেন — বাঙালীর নতুন কুলীন সমাজ। এরা জনসাধারন থেকে সরে গেলেন এবং ব্যাবসায়ের কাজকে দেখতে শিখলেন অবজ্ঞার চোখে। ফলে আমরা যখন বাংলাদেশের বাইরে বৃহত্তর বঙ্গ গঠনে ব্যস্ত, সেই অবসরে বাংলার বুকে বৃহত্তর বিহার, মাড়োয়ার, পাঞ্জাব জেঁকে বসলো। এ অবস্থায় প্রতিকার কি ? বাঁচতে হলে ব্যবসা ক্ষেত্রেই বাঙালীকে ঝুঁকতে হবে। আত্মরক্ষার অস্ত্র শিল্প বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র জীবন যুদ্ধে দেশবাসীর পরাজয়ের কথা আর্তকণ্ঠে চীৎকার করে বলে গেছেন। রাজা মণীন্দ্র নন্দী বা ব্রজেন্দ্র কিশোর চৌধুরীর মতো শিল্পোৎসাহী এদেশে জন্মেছেন বটে, কিন্তু তাদের সংখ্যা নগণ্য। বঙ্গদেশের অর্থনৈতিক ইতিহাসবিদ্‌রা মনে করেন যে, ১৮৪৮ সালে কলকাতায় ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে শিল্পে বাঙালী উদ্যোগের সূর্য অস্তমিত হচ্ছে। কিন্তু এই মত সর্বাংশে সত্য নয়। কারণ, জাতীয় জীবনের এই সন্ধিক্ষণে কলকাতায় বাঙালী উদ্যোগের সূর্যাস্ত হলেও বঙ্গদেশের এই প্রান্তে অর্থাৎ উত্তরবঙ্গে বহু চা বাগান বাঙালী উদ্যোগে গড়ে উঠতে থাকে।[১] মুখ্যত এঁরা ছিলেন পূর্ববঙ্গ থেকে ভাগ্যান্বেষণে আসা জলপাইগুড়ি শহরের সাধারণ মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক। প্রথমে এলেন কাঠ ব্যবসায়ীরা, কিন্তু সংখ্যায় কম। পরে এলেন উকিলরা, জোতদাররা এবং সর্বশেষে চা-বাগানের কর্মচারীরা (Tea Garden Employees)। ইংরেজরা চা বাগান খুলে বাগানের কোম্পানী হেড অফিসগুলি স্থাপন করেন কলকাতায়। কিন্তু বাঙালীদের বাগানগুলির হেড অফিস খোলা হয় জলপাইগুড়ি শহরে, যার সংখ্যা ছিল ৮৯টি।[২] এই সময় শিলিগুড়ির পাশে বাঙালী উদ্যোগে অনেকগুলি চা বাগান গড়ে উঠলেও শিলিগুড়িতে তার কোন হেড অফিস ছিল না, বেশীর ভাগই ছিল জলপাইগুড়িতে। কাজেই বিংশ শতকের গোড়া থেকেই জলপাইগুড়ি শহর এবং জেলার আর্থিক অবস্থা বাংলার অন্যান্য অনেক জেলা থেকেই বেশী সমৃদ্ধ ছিল। জলপাইগুড়ি শহর থেকে তরাই-ডুয়ার্স অঞ্চলের দুর্গম স্থানগুলিতে যাওয়া যেমন কষ্টসাধ্য ছিল, তেমনি প্রাণ সংশয়কর। কোন কোন জায়গায় পৌছতে ৪/৫ দিন লেগে যেত। এঁরা যেতেন গরুরগাড়ীতে সঙ্গে থাকতো চিড়া, মুড়ি, গুড়, খাবার জল এবং বন্দুক। বাঙালী উদ্যোগীরা যে অপরিসীম এবং অকল্পনীয় কষ্ট স্বীকার করে চা বাগান তৈরী করে গেছেন— বর্তমান প্রজন্মের পক্ষে সেটি উপলব্ধি করা অথবা মূল্যায়ন করা অত্যন্ত কঠিন।

এই প্রবন্ধটির আলোচনা আমি প্রথম ও দ্বিতীয় পুরুষাধীন বাঙালী চা-করদের জীবনযাত্রার মধ্যেই সীমিত রাখছি, তৃতীয় বা চতুর্থ পুরুষে যাচ্ছি না। কারণ, যে রুচিশীল জীবনযাত্রা আমরা এই প্রথম / দ্বিতীয় পুরুষাধীন বাঙালী চা-করদের মধ্যে খুঁজে পাই, তাঁদের উত্তরাধিকারী তৃতীয় / চতুর্থ পুরুষের মধ্যে তা কখনই দেখা যায় নি। উচ্ছৃঙ্খলতা, বেপরোয়া জীবনযাত্রা ছিল তাদের নিত্য সঙ্গী। তাছাড়া, এই প্রবন্ধটির সময়সীমা ঔপনিবেশিক পর্ব পর্যন্ত বেঁধে রাখবার মূল কারণই হল স্বাধীনতা- উত্তর পর্ব থেকে অর্থাৎ তৃতীয় পুরুষাধীন বাঙালী চা-করদের সময় থেকে বাগানগুলির মালিকানা অ-বাঙালীদের কাছে হস্তান্তরিত হওয়া শুরু হয়।

কোচবিহার রাজ্যে ইতিহাসচর্চার বিকাশ ঃ একটি ঐতিহাসিকক পর্যবেক্ষণ।

বাপ্পা মহন্ত

(এক)

আলোচনার গভীরে যাওয়ার আগে শিরোনাম সম্পর্কে ইতিহাস তন্নিষ্ট পাঠকবৃন্দের নিকট কিছু বলার প্রয়োজন অনুভব করছি। কোচবিহার রাজ্য বলতে এখানে 'দেশীয় রাজ্য কোচবিহারকে' বুঝিয়েছি। ভারতের স্বাধীনতা লাভের আগে পর্যন্ত ব্রিটিশ শাসিত ভারতের বাইরে প্রায় যে ৫০০ টি দেশীয় রাজ্য ছিল, তার মধ্যে কোচবিহার রাজ্য ছিল ইংরেজদের করদ মিত্র দেশীয় রাজ্য।[১] ১৭৭৩ খ্রিষ্টাব্দে 'ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর' সাথে এক ঐতিহাসিক চুক্তির মধ্য দিয়ে দেশীয় রাজ্য কোচবিহার ইংরেজদের করদ মিত্র রাজ্যে পরিণত হয়েছিল।[২] দেশভাগের পর ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী কোচবিহার রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলায় রূপান্তরিত হয়েছিল।[৩] তাই ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারীর পূর্বে দেশীয় রাজ্য কোচবিহারের ইতিহাসচর্চার বিকাশের ধারাবাহিক চিত্রটি এই আলোচনায় স্থান পাবে। জেলা কোচবিহারের ইতিহাস চর্চার কোন বিবরণ এখানে নেই।

(দুই)

এবার মূল আলোচনায় প্রবেশ করছি। উত্তর-পূর্ব ভারতে ষোড়শ শতাব্দীতে কোচ্ রাজবংশের উদ্ভব ঘটেছিল। কোচবিহারের সাহিত্য সাধনার সূচনা কোচ রাজবংশের সৃষ্টিকাল থেকেই। ইংরেজ আগমনের পূর্ব পর্যন্ত বাংলার সাহিত্য সাধনার কেন্দ্রগুলি ছড়িয়েছিল চট্টগ্রাম, বরিশাল, ময়মনসিংহ, বাঁকুড়া, বৰ্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ থেকে কামতা-কোচবিহার পর্যন্ত। যে সব রাজসভা বাংলার সাহিত্য জগতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে তাদের মধ্যে কোচবিহার রাজ্য অন্যতম।[৪] ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের মতামত এপ্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ, তিনি বলেছেন, "ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ এই সাহিত্যে অনেক বেশী পরিমানে পাওয়া যায়। ত্রিপুরায় রামায়ণ মহাভারতের অনুবাদ নাই, কোচবিহারে আছে। পুরানাদি অনুবাদও সংখ্যার দিক দিয়া কোচবিহারেই বেশী।"[৫] তবে কোচবিহার রাজ্য সাহিত্য সাধনায় উল্লেখযোগ্য উন্নতি বা প্রসার লাভ করলেও ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে সেই উদ্যোগ দীর্ঘদিন দেখা যায়নি। অথচ ষোড়শ শতক থেকেই কোচবিহারে একটি সংস্কৃতিক পরিমন্ডল গড়ে উঠেছিল।[৬] যাইহোক, বিলম্ব হলেও মহারাজা প্রাননারায়নের (১৬২৫-১৬৬৫ খ্রীঃ) আমলে প্রথম কোচবিহার রাজ্যে ইতিহাস লেখা শুরু হয়। এই সময়ে কবিরত্ন 'রাজখন্ডম' নামে কোচ্ রাজবংশের একখন্ড ইতিহাস লেখেন। শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ লেখেন 'বিশ্বসিংহ চরিতম'। আমরা কেবলমাত্র এই গ্রন্থ দুটির নামই পেয়ে থাকি। বই দুটির অস্তিত্ব সম্পর্কে ইতিহাস নীরব।[৭] মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণে আমলে (১৭৮৩-১৮৩৯ খ্রিঃ) 'গোসানী মঙ্গল' নামে একটি গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। বইটির লেখক ছিলেন রাধাকৃষ্ণ দাস বৈরাগী। 'গোসানী মঙ্গল' কাব্যের পুঁথিতে সেন রাজবংশের উত্থানের বৃত্তান্ত রয়েছে। তবে 'গোসানী মঙ্গল' কাব্যের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে সন্দিহান কোচবিহারের ইতিহাস গ্রন্থের লেখক খান চৌধুরী আমানত উল্লা আহম্মদ। তিনি ওই গ্রন্থের পাদটীকায় লিখেছেন—

"গোসানীমঙ্গল আধুনিক পুঁথি, উহা কোচবিহারের মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালে (উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে) রাধাকৃষ্ণ দাস বৈরাগী নামক জনৈক স্থানীয় ব্যক্তি কর্তৃক পদ্যছন্দে রচিত হইয়াছিল।[৮]

(তিন)

মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালে বাংলা পুরান রচনার স্বর্ণযুগ হলেও পরবর্তী মহারাজ শিবেন্দ্র নারায়ণের (১৮৩৯-১৮৪৭ খ্রিঃ) সময়কাল থেকেই কোচবিহারের ইতিহাস রচনায় নতুন উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়। মুনশি জয়নাথ ঘোষ এই সময়ে লেখেন 'রাজোপাখ্যান'।[৯] লেখক নানা স্থান থেকে তথ্য সংগ্রহ করে 'রাজোপাখ্যান' লেখেন। কারণ সেই সময়কালে কোচ্ রাজবংশের

গোঁসানীমারি ঃ ইতিহাস ও জনশ্রুতি

দেবাশীষ দে

কোচবিহার জেলার অর্ন্তভুক্ত দিনহাটা মহকুমার একটি অন্যতম প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান রূপে গোঁসানীমারী ইতিহাসে সু-প্রসিদ্ধ। এই গোঁসানীমারী ছিল স্বাধীন কামতাপুর রাজ্যের এবং খেন বংশের রাজাদের সর্বশেষ রাজধানী। নীলধ্বজ ছিলেন এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা।[১] নীলধ্বজ (১৪৪০-১৪৬০ খ্রীঃ), ছাড়াও চক্রধ্বজ (১৪৬০-১৪৮০ খ্রীঃ) এবং নীলাম্বর (১৪৮০-১৪৯৮ খ্রীঃ) নামে আরও দুইজন রাজা কামতা রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন।[২] খেন বংশীয় এই রাজাদের উপাধী ছিল "কামতেশ্বর"।[৩] বর্তমানে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হিসাবে এই রাজধানীর প্রাচীন দুর্গ বা রাজপাট এবং প্রাচীন কামতেশ্বরী মন্দিরটি লক্ষ্যনীয়।[৪]

১. গোঁসানীর রাজপাট

কোচবিহার রাজসভার একজন বিদগ্ধ ঐতিহাসিক খান চৌধুরী আমানতউল্লা আহমদ-এর লেখনি অনুসারে পঞ্চদশ শতকে ধরলা নদীর পশ্চিমে কামতাপুরের সুবিশাল দুর্গ বা গোঁসানীমারির দুর্গটি অবস্থিত ছিল, যা বর্তমান কোচবিহার জেলার দিনহাটা মহকুমা থেকে ১৩ কি.মি. দূরে এবং ২৬°৮'২০" উত্তর থেকে ৮৯°২১'৩৬" পূর্বে অবস্থিত।[৫] গোঁসানীমারি নামটি স্থানীয় ভাষা 'গোঁসানীমারই' অর্থাৎ দেবীস্থান থেকে উদ্ভব হয়েছিল।[৬] গোঁসানীমারি দুর্গের ইতিহাস বা কামতাপুর রাজ্যের ইতিহাস বহুস্থানে বিবিধ প্রকারে আলোচিত হয়েছে। ডঃ শৈলেন দেবনাথ-এর মতানুসারে, কামতাপুর রাজ্যের প্রথম রাজা ছিলেন সঙ্গলদীপ এবং কামতাপুর রাজ্যের প্রথম রাজধানী বর্তমান চিলাপাতা অরণ্যে অবস্থিত ছিল, যা নলরাজার গড় রূপে ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ। এরপর এই রাজ্যের রাজধানী স্থানান্তরিত হয় ময়নাগুড়িতে এবং পরে পৃথুরাজার গড়ে। ত্রয়োদশ শতকে কামতাপুর রাজ্যের রাজধানী সেখান থেকে গোঁসানীমারী বা সিঙ্গিমারীতে স্থানান্তরিত হয়েছিল। ১৮০৮ খ্রীঃ যখন ডঃ বুকানন হ্যামিল্টন সিঙ্গিমারী বা গোঁসানীমারি অঞ্চল পরিদর্শনে গিয়েছিলেন তখন তিনি পর্যবেক্ষণ করেছিলেন যে, ধরলা নদী গোঁসানীমারি দুর্গকে বহিঃশত্রুর আক্রমনের হাত থেকে সুরক্ষিত রেখেছে। আবার, অনুরূপভাবে সিঙ্গিমারী নদী সিঙ্গিমারী দুর্গের মাঝ বরাবর প্রবাহিত হয়েছে।

ডঃ বুকানন হ্যামিল্টন ১৮০৮ খ্রীঃ সুপ্রসিদ্ধ কামতাপুরের দুর্গ পরিদর্শন করেছিলেন। তাঁর লেখনি থেকে অবগত হওয়া যায় যে, কামতাপুরের ন্যায় বিশালাকার এবং সুনির্মাণ কৌশলে সুরক্ষিত দুর্গ উত্তর-পূর্ব ভারতে আর লক্ষণীয় নয়। এই দুর্গের পরিধি ছিল প্রায় ১৮ মাইল এবং প্রবেশদ্বারগুলি বাদে গড়ের চারদিকের পরিখা নির্মিত ছিল মাটি দিয়ে। এই দুর্গে প্রবেশ করার জন্য কয়েকটি প্রবেশদ্বার ছিল, যা পরিচিত ছিল শিলদুয়ার, বাঘদুয়ার, জয়দুয়ার, সন্ন্যাসী দুয়ার, হোকো দুয়ার, নিমাই দুয়ার রূপে। দুর্গের পূর্বদিকে ছিল ধর্মদুয়ার, উত্তরে অক্ষয় দুয়ার, দক্ষিণে ছিল শিলদুয়ার এবং বাঘদুয়ার।[৭] এই প্রবেশদ্বারগুলির উভয় পার্শ্বে কিছু দূর দেওয়াল তৈরি ছিল ইঁট দিয়ে, যা ক্রমশ ধ্বংসপ্রায়। ডঃ বুকানন হ্যামিল্টনের পরিদর্শনকালে ক্ষুদ্রকায় সিঙ্গিমারী নদী দুর্গের অভ্যন্তর দিয়ে উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে দুর্গকে দুই ভাগে ভাগ করেছিল। ১৮২০ খ্রীঃ প্রবল বন্যায় বৃহৎ মানসাই নদী নিজের গতিপথ পরিত্যাগ করে সিঙ্গিমারীর সাথে মিশে গড়ের নিকটে দক্ষিণে ধরলা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়।[৮] সিঙ্গিমারীর পশ্চিমে গড়ের প্রাচীরের কিছু অংশ এখনও অক্ষয় অবস্থায় লক্ষ করা যায়। শিলদুয়ার এবং বাঘদুয়ারের নিকটে ৩০ ফুট, জয়দুয়ার দক্ষিণে এবং তার পূর্বদিকে ৩৫ ফুট, জয়দুয়ারের পূর্বে সিঙ্গিমারী নদীর নিকট ৪০ ফুট; যদিও প্রাচীরগুলির তলদেশের বিস্তার সর্বত্র সমান না কিন্তু ২০০ ফুটের নিচে এর বিস্তার কোথাও লক্ষণীয় নয়।[৯] গড়ের প্রাচীরের বিস্তার প্রায় সর্বত্রই ২৫০ ফুট, তবে বাঘদুয়ারের উত্তরে ৫৫০ ফুট এবং দক্ষিণে ৬০০ ফুট পর্যন্ত বিস্তৃত আছে। জনশ্রুতি আছে যে, এই পশ্চিমদ্বার বাঘদুয়ার এর পথেই মুসলিম

'মধুপুর ধাম এবং বৈকুণ্ঠপুর দামোদরদেবের ধামঃ কোচবিহার রাজআমলে কামরূপী বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার ও প্রসার কাহিনী'

কৌশিক চক্রবর্ত্তী

তৎকালীন কামরূপ তথা অধুনা অসম রাজ্যে এবং তৎকালীন কুচবিহার রাজ্যে নব বৈষ্ণবধর্মকে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন শ্রীমন্ত শঙ্করদেব। তিনি অসম ও কোচ রাজ্যের বৈষ্ণব ধর্মের প্রধান প্রবর্তক রূপেও পরিচিত। আনুমানিক ১৪৮৬ খ্রীঃ (মতান্তরে ১৪৮৭ খ্রীঃ) অসমের নওগাঁও জেলার বড়োদোয়া গ্রামে শংকর ভুঁইয়া জন্মগ্রহন করেছিলেন।[১]

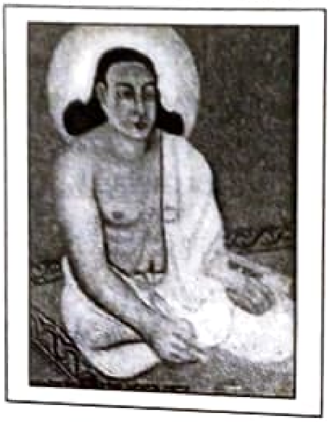

মৌখিক ইতিহাস অনুসারে ১৪৪৯ খ্রীঃ বাংলার আশ্বিন মাসে, শুক্ল দশমীতে, বৃহস্পতিবার শংকরদেবের জন্ম হয়েছিল। তাঁর পিতা ছিলেন কুসুম্বর ভুঁইয়া ও মাতার নাম ছিল সত্যসন্ধ্যা দেবী। শংকর দেবের প্রতিভার স্ফুরণ প্রায় ১৩ বৎসর বয়স থেকেই প্রকাশ পায়। তিনি প্রাচীন তথা আদি বাংলা ভাষায় (মতান্তরে অসমীয়া ভাষায়) পদ্য লিখতেন এবং পরবর্তী কালে তাঁর ধর্মদর্শন জনপ্রিয়তা লাভ করে। তাই তিনি 'শ্রীমন্ত' অর্থাৎ "জ্ঞানী" উপাধিতে ভূষিত হন এবং তার ধার্মিক চিন্তার জন্য 'দেব' উপাধীতে পরিচিত হন। তাই বাংলা ও অসম অঞ্চলে তিনি শ্রীমন্ত শংকর দেব বলে সুপরিচিত। শংকর দেবের প্রথম স্ত্রী-র নাম ছিল সূর্যবতী দেবী এবং পরবর্তীকালে কালিন্দীদেবীর সাথে তাঁর দ্বিতীয় বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল। আনুমানিক ১৫৬৮ খ্রীঃ শংকরদেব পরলোক গমন করেছিলেন।

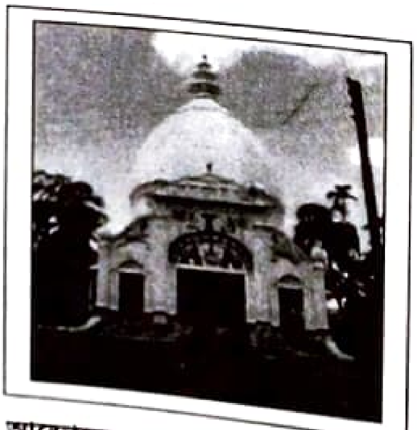

শংকর দেবের বৈষ্ণব আন্দোলন তথা কামরূপী বৈষ্ণব আন্দোলনের পূর্ববর্তী সময়ে উত্তরবঙ্গ এবং অসম অঞ্চলে কোনো বৈষ্ণব আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল কিনা সে সম্বন্ধে কোনো ঐতিহাসিক তথ্যসূত্র পাওয়া যায় না। তবে কিছু মৌখিক উপকথায় বলা হয় যে, সপ্তম এবং অষ্টম শতাব্দীতে কিছু বৈষ্ণবধর্ম প্রবর্তক এই অঞ্চলে এসেছিলেন যেমন- রামানন্দ, নিমানন্দ, গদাধর এবং

ইতিহাসে এবং সংস্কৃতি চর্চায় নবদ্বীপের স্থান ও অবদান

অখিল সরকার

বিভিন্ন সময়ে নবদ্বীপে ইতিহাসের যে সকল যুগান্তকারী এবং আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল তার দ্বারা সমগ্র দেশ ও জাতির চিন্তা ও চেতনার রাজ্যে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। এই সমুদয় বিস্ফোরণমূলক ঘটনা ও উপাদান পর্যালোচনা করলে সমগ্র বাংলাদেশে বাঙ্গালী জাতির ইতিহাসে নবদ্বীপের অবদানের ঐতিহাসিক গুরুত্বের বিষয়টি স্মরণে রেখে ঐতিহাসিক বিচারে নতুন দিগন্ত সৃষ্টিকারী নবদ্বীপের প্রয়াসকে বিভিন্ন সূত্রে উপস্থাপিত করা যায়, যেমন 'নবদ্বীপ' ও 'নদিয়া' জনমানসে এই দুটি নামেই জনপদটি পরিচিত। ভারতবর্ষে বারংবার বিদেশী আক্রমণের দরুন এইসব বিদেশীদের বিজাতীয় উচ্চারনের ফলে কিছু কিছু নামের পরিবর্তন ঘটেছে যেমন ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মুসলমানী উচ্চারনে লক্ষ 'লক্ষনাবতী' হয়েছে 'লখনৌতি' 'বর্ধমান' হয়েছে 'বরদওয়ান' তবে নবদ্বীপের 'নদিয়া' নামকরন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কারণ নবদ্বীপ যে 'নদীয়া' 'নওদীহ' বা নদীয়াহ হয়েছে তা উচ্চারনের বিভ্রাটের জন্য নয়, ভাষান্তরের জন্য রজনীকান্ত চক্রবর্তী স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন। মিনহাজউদ্দিন সিরাজের গ্রন্থে নবদ্বীপকে 'নওদিয়ার' বলা হয়েছে। 'নওদিয়ার' শব্দের অর্থ নতুন দেশ।[১] 'নতুন দেশ' বলতে এখানে গঙ্গা বিধৌত পলিসঞ্চিত নতুন দ্বীপকেই বোঝান হয়েছে। 'নতুন দ্বীপ' থেকে 'নবদ্বীপ' নামটি এসেছে একথা স্বীকার করার পেছনে অনেক যুক্তি আছে।

কবি কর্ণপুর তার 'চৈতন্য চরিতামৃত' কাব্যে নবদ্বীপকে 'নবীন দ্বীপ' বলে উল্লেখ করেছেন [২]। নুলো পঞ্চানন বলেছেন- ''কহেন রাজা কাহার কথা অভিলাষ।

নব নব দ্বীপপুঞ্জ নবদ্বীপ প্রকাশ।[৩]

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ভক্ত প্রবর নরহরি চক্রবর্তী ওরফে ঘনশ্যাম দাস প্রচার করেন যে, নবদ্বীপ হচ্ছে নয়টি দ্বীপের সমষ্টি। তিনি বলেন

'দ্বীপ নাম শ্রবণে সকল দুঃখ ক্ষয়।
গঙ্গা পূর্ব পশ্চিম তীরেতে দ্বীপ নয়।।
পূর্বে অন্তর্দ্বীপ, শ্রী সীমন্তদ্বীপ হয়।
গোদ্রুমদ্বীপ, শ্রীমধ্যদ্বীপ চতুষ্টয়।।
কোলদ্বীপ, ঋতু, জহ্নু, মোদদ্রুম আর।
রুদ্রদ্বীপ এই পঞ্চ পশ্চিমে প্রচার।[৪]

এই দ্বীপগুলির বর্তমান অবস্থান হচ্ছে অন্তর্দ্বীপ বর্তমানে বাবলারী গ্রাম। এখানেই ছিল প্রাচীন নবদ্বীপ নগরীর অবস্থান। সীমন্তদ্বীপ সিমলিয়া, বর্তমানে বামুনপুকুর, গোদ্রুমদ্বীপ-গাদিগাছা, বর্তমানে ভাগীরথির পূর্বে ও জলঙ্গির দক্ষিণে অবস্থিত। মধ্যদ্বীপ মাজদিয়া, বর্তমানে গাদিগাছার দক্ষিণে ভাগীরথির দক্ষিণে অবস্থিত। কোলদ্বীপ-কুলিয়া- পাহাড়পুর, বর্তমানে নবদ্বীপ শহরের দক্ষিণে অবস্থিত। ঋতুদ্বীপ-রাতুপুর, বর্তমানে রাহাতিপুর জহ্নুদ্বীপ- জাহান্নগর, মোদদ্রুমদ্বীপ- মামগাছি, রুদ্রদ্বীপ- রুদ্রপুর বর্তমানে লুপ্ত। তবে নরহরি কল্পিত নয়টি দ্বীপ বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের বাস্তবতা নির্ণয় যথেষ্ট কঠিন। কৃত্তিবাস ওঝা রামায়ণ মহাকাব্যে নবদ্বীপ কে সপ্তদ্বীপের মধ্যে একটি অন্যতম দ্বীপ বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, সপ্তদ্বীপের মধ্যে সার নবদ্বীপ গ্রাম।[৫] ডঃ ক্ষুদিরাম দাসের মতে নবদ্বীপ অর্থে জলপথের দ্বারা বিচ্ছিন্ন নয়টি দ্বীপ নয়। নব-উদ্ভূত দ্বীপ, ভাগীরথী এবং জলঙ্গীর প্রবাহ দ্বারা বেষ্টিত দ্বীপাকৃতি অঞ্চল।[৬]।

শুর বংশের রাজা আদিশুর পাল আমলের শেষ পর্বে একজন সামন্ত নৃপতি ছিলেন। রাঢ় বঙ্গের কোন এক ক্ষুদ্র অংশে ইনি রাজত্ব করতেন। অবশ্য আদিসুরের সময়কাল নিয়ে পন্ডিতদের

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল কাব্য পাঠের প্রয়োজনীয়তা

মিঠুন দত্ত

তেইন সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে race, melinum এবং moment এর কথা বলেছেন। সাহিত্য সমালোচনার এই পদ্ধতি বহুদিনের। মধ্যযুগের সাহিত্যগুলি আলোচনার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিগুলি অবলম্বন করা হয়েছে। তবে একবিংশ শতাব্দীর অবিশ্বাস, একাকিত্ব, ক্ষমতা হস্তান্তরের নতুন জটিল কুটিলতা, স্বার্থান্বেষী, যুক্তি-তর্ক ও বিনির্মানের আবর্তে মঙ্গল কাব্যগুলি নানা প্রশ্ন জাগ্রত করে— (১) মঙ্গলকাব্যের কবিদের কি কোন ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ছিল না ? কাব্য গুলির মূল্য কি জাতীয়তা, সাময়িকতার মধ্যে আবদ্ধ, স্বাতন্ত্রতা কি নেই ? কবিরা কি দেব-দেবীর-মাহাত্ম্য কাহিনী প্রচারের অক্লান্ত প্রয়াসে ব্যস্ত ছিল ? চরিত্রগুলি কি কেবল সেই সময়কার শেখানো কথার প্রতিধ্বনি? না কি এরা কোন আলাদা মেসেজ দেয় ? কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল কাব্য পাঠ করলে উপলব্ধি হবে যে কেবল দেব-দেবীর নিন্দাজনক, বিষয় নয়, সেই কাব্যগুলি এখনকার সময়, অবস্থার কথা নিভৃতে বলে যায়। তবে আধুনিক যুগের ফসল নিয়ে আমরা অন্ধমোহে ব্যতিব্যস্ত, আমরা একটু উষ্ণ-স্পর্শ দিয়ে ভাবি না যে বর্তমান চেতনার অতীতের মৃত্তিকা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়।

আদি মঙ্গলকাব্য গুলি মৌখিকরূপেই সমাজে প্রচলিত ছিল, সেইগুলি গায়েন গাইতেন সকলের মঙ্গল কামনা করে। তাতে যে শুনত এবং যে শুনাত উভয়েরই মঙ্গল সাধন হত। পরবর্তীতে কবিরা এগুলিকে লিখিতরূপ দেবার সময় দেব-দেবীর বন্দনা এবং তার প্রতি অনুগ্রহ প্রার্থনা করে কাব্য রচনায় ব্রতী হতেন। মনসামঙ্গল কাব্যের শেষে প্রথাগত ভাবে দেবী মনসার জয় এবং মানুষ চাঁদের পরাজয় দেখানো হয়েছে। প্রসঙ্গত উনবিংশ শতাব্দীর আধুনিক মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর "মেঘনাদ বধ" কাব্যেও সরস্বতী বন্দনা তথা দেবী বন্দনা দিয়ে শুরু করেছেন। কিন্তু দেখিয়েছেন রামায়ণকে রাবনায়নরূপে। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল কাব্যের কাহিনী বিবেচনায় আমাদের একক প্রথাগত ভাবনা গোড়ায় একটু নড়ে চড়ে ওঠে।

সাধারণত মঙ্গলকাব্যগুলিতে দেবতাদের মহত্ব ও ভক্তের প্রতি কৃপা দৃষ্টি বর্ষনকে আমরা শ্রদ্ধা করি এবং তাদের অনুগ্রহ প্রার্থনা করে থাকি যাতে দেবতা কর্তৃক আমাদের মঙ্গল সাধন হয়। কিন্তু মনসামঙ্গল কাব্যে মনসা অত্যাচারী, হৃদয়হীনা, ছলনাময়ী ও ক্রূর স্বভাবের এটা সকলেরই জানা আছে। তাঁর চরিত্রের এই হীন অপগুণ বর্ধিত হয়েছে মুখ্যত চাঁদের উপর। তাই চাঁদ বলেছে—'বলে চেঙ্গমুড়ি বেটি কিসের দেবতা। মারিব মাথায় বাড়ি না বাঁচিবে আর। আপদ ঘুচিবে মম পাব-অব্যাহতি। পরম কৌতুকে হবে রাজ্যের বসতি'। মানুষ চাঁদের এই প্রতিক্রিয়ায় মনসাকে দেবী বলে মনে হয় না। বরং মনসাকে এক হিংস্র ক্ষমতা লিপ্সু বিত্তবান মানুষের প্রতিকৃতি বলে মনে হয়। তার সঙ্গে চাঁদের লড়াই ক্ষমতার লড়াই। এই ক্ষমতাই ন্যায়-নীতি-ভালোবাসা, স্নেহ-মমতার সম্পর্কের বাধন ছিন্ন করে দিতে পারে এবং এর বশবর্তী হয়ে দুর্নীতি-অপকর্ম করতে পিছপা হবে না। বর্তমান সময়ে আমরা এরূপ একটি জটিল আবর্তের মধ্য দিয়ে চলেছি, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসা তারই ইঙ্গিত দেয়।

মনসামঙ্গলে মনসার উদ্দেশ্য ছিল চাঁদের মত শক্তিশালী বিত্তবানকে তার অনুগত করা। তাকে চাঁদ অস্বীকার করলে মনসা প্রথম তার ধন-সম্পদ ও ঐশ্বর্যের দিকটি দুর্বল করতে চেষ্টা করেছে। তার সপ্তডিঙ্গা ও ঐশ্বর্যস্বরূপ পুত্রদের বিনাশ করে দিয়েছে। এই শক্তিশালী বিত্তবান ও সমাজে প্রতিষ্ঠিত মানুষটি নিরুপায় হয়ে ভিক্ষা, কাষ্ট বিক্রি, মাঠের মজুরের কাজে নামতে বাধ্য হয়েছে মনসার ছলনায় সে নিজের চাকর ও নিজের স্ত্রীর দ্বারা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়েছে। সেই চাঁদ শেষে মনসার পূজা করতে বাধ্য হয়েছেন। এতে আপাত অর্থে মনসামঙ্গল কাব্যের কাহিনী

রূপবৈষম্য – কালো মেয়ের কপাল মন্দ

প্রাণ কুমার রজক

দর্শনশাস্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ শাখা 'নীতিবিদ্যা'য় 'বৈষম্য' আলোচ্য বিষয় হিসাবে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। এই বৈষম্যের মধ্যে আছে 'জাতি-বৈষম্য, বর্ণ-বৈষম্য, লিঙ্গ-বৈষম্য ও ধর্ম-বৈষম্য'।[১] এখানে আমার আলোচ্য বিষয় হল- রূপ-বৈষম্য, যা বেশির ভাগ মেয়েদের ক্ষেত্রে ঘটে থাকে। কিন্তু প্রথমে দর্শনশাস্ত্র ও নীতিবিদ্যা সম্পর্কে দু-চার কথা জেনে নিই।

পাশ্চাত্য দেশে যা 'Philosophy' ভারতবর্ষে তাই 'দর্শনশাস্ত্র'। কিন্তু 'Philosophy' এবং 'দর্শনশাস্ত্র'-এই দুটির অর্থ এক নয়। 'ব্যুৎপত্তির দিক থেকে 'Philosophy' শব্দের অর্থ হল 'জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ'। আর 'দর্শন' শব্দের অর্থ হল 'সত্যদর্শন' বা 'তত্ত্বদর্শন'।[২] দর্শন বা দর্শনশাস্ত্র সত্যকে উপলব্ধি করতে চায়। দর্শনের লক্ষ্য হল বস্তু বা বিষয়ের স্বরূপ সন্ধান। এই লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্য দর্শনকে তিন ধরনের কাজ করতে হয়- ব্যাখ্যা দান, যথার্থ নির্ণয় এবং মূল-বিচার। দর্শনের কাজ হল সঠিক ব্যাখ্যা দেওয়া এবং মূল্য বিচার। হল সেই সঠিক ব্যাখ্যার অন্যতম অঙ্গ। কোনো না কোনো আদর্শের সঙ্গে তুলনা করে আমাদের অভিজ্ঞতার মূল্য বিচার করতে হয়। আমাদের অভিজ্ঞতার তিনটি অঙ্গ হল- চিন্তা, ইচ্ছা ও অনুভূতি। দর্শন সত্যতার মূল্যে চিন্তাকে, শিব বা কল্যাণ বা সততার মূল্যে ইচ্ছাকে এবং সৌন্দর্য্যের মূল্যে অনুভূতিকে মূল্যায়িত করতে চায়। সত্য, শিব ও সুন্দর- হল তিনটি পরমমূল্য।

নীতিবিদ্যা হল দর্শনের একটি প্রধান শাখা। 'বৈষম্য' আলোচিত হয়েছে ব্যবহারিক নীতিবিদ্যায়। নীতিবিদ্যার পরম মূল্যটি হল শিব বা কল্যাণ বা সততা। সকলের কল্যাণ কামনা-ই হল নীতিবিদ্যার মূল্য লক্ষ্য। আজকের বর্তমান সমাজে যে সমস্ত অপরাধ বা সমাজবিরোধী ঘটনা ঘটে চলেছে সে সবই ব্যবহারিক নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়। যেমন- মানুষের অধিকার, বৈষম্য- (জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ ও ধর্ম), হত্যা-(নর-হত্যা, প্রাণী হত্যা, গর্ভপাত বা ভ্রূণ-হত্যা ও শিশু হত্যা), ইউথানেসিয়া (সৌজন্য-হত্যা), আত্মহত্যা, নারীবাদ, যুদ্ধ ও হিংস্রতাঃ সন্ত্রাসবাদ, অপরাধ ও শাস্তি, দরিদ্র, প্রাচুর্য ও নৈতিকতা। মানুষের অধিকার প্রসঙ্গে আমরা বৈষম্য কথাটি পাই। মানুষের অধিকার বলতে বোঝায় সব মানুষের সমান অধিকার কয়েকটি বিষয়ে। কিন্তু ঐ অধিকার- মানবসমাজে আজ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা হয়নি। রূপ-বৈষম্য ও জাতি-বৈষম্যের মধ্যে ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। কারণ জাতি-বৈষম্য বলতে সাধারণত দক্ষিণ আফ্রিকা ও আমেরিকার সাদা ও কালোর মধ্যে আমেরিকান ও নিগ্রোদের মধ্যে বৈষম্যকে বোঝান হয়। এছাড়া আরও অন্যদের সঙ্গে বৈষম্যকে বোঝানো হয়। কিন্তু রূপ-বৈষম্য বলতে আমি বলতে চাইছি শ্বেতাঙ্গীর সঙ্গে শ্যামাঙ্গী বা কৃষ্ণাঙ্গীর বৈষম্য ; তবে কোন জাতিগত অর্থে নয়। একটি কালো মেয়েকে আমাদের সমাজ থেকে কতভাবে বিভিন্ন দিক থেকে কত অত্যাচার, অপমান সহ্য করতে হয়, সে যে কোন জাতি, সম্প্রদায় বা যে কোন দেশ হোক না কেন।

'বৈষম্য' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল 'বিষম আচরণ'।[৩] বিভিন্ন প্রাণী বা ব্যাপক ভাবে বিভিন্ন মানুষের মধ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে 'সম আচরণ না করা' বা 'বিষম আচরণ করা' কেই বৈষম্য বলা হয়। বৈষম্য প্রকৃতিগতভাবে মানুষে মানুষে দেখা যায়- একথা অস্বীকার করা যায় না। বোধ শক্তির দিক থেকে কর্মদক্ষতার দিক থেকে, নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে মানুষে মানুষে ভেদ বা বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। আমরা বাস্তবে লক্ষ্য করি কোন মানুষের বুদ্ধি কম আবার কোন মানুষের বুদ্ধি বেশী। নির্দিষ্ট কর্মে কোন একজন মানুষ দক্ষ এবং অন্য কেউ সেই কর্মে অদক্ষ। একজনের কাছে

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে নারীর অবস্থান

বিভূতিভূষণ বিশ্বাস

ভারতীয় সমাজ কেন বিশ্বের সব সমাজ-ব্যবস্থায় ছিল নারী-পুরুষের বৈষম্য। বিশ্বের অন্যান্য সাহিত্যের মত ভারতীয় সাহিত্যের মধ্যেও ফুটে উঠেছে। বিশেষ করে বঙ্গ-কবিকূলের হস্ত ক্ষেপে একের পর এক কাব্য-সাহিত্যের মধ্যে নারী-কূলের যন্ত্রণার ধ্বনি শুনতে পাই। সেই প্রাচীন-সাহিত্য থেকে শুরু করে মধ্যযুগীয় সাহিত্যের যে দিকেই নজর দি-ই না কেন নারীর আর্তনাদ আমাদের ব্যথিত করে তোলে। ব্যথিত হৃদয়-মন খুঁজতে বসে, সেই নারীর আর্তনাদ ছাড়া আত্মপ্রতিষ্ঠার তাগিদকেও। বহু শতাব্দী-পথ পেরিয়ে এসে কবিদের কণ্ঠে নারী পুরুষের বৈষম্যকে অস্বীকার করে উচ্চারিত হল-

"সাম্যের গান গাই-
আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোন ভেদাভেদ নাই।"

নারী পুরুষের বৈষম্য চলে আসছে মানব সমাজের একেবারে আদিম যুগের পরবর্তী সময় থেকেই, চলে আসছে মানব-সভ্যতা-বিকাশের বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে। এই বিভিন্ন স্তরে আমরা দেখি এই বৈষম্য কখনো নগ্ন, কখনো প্রচ্ছন্ন, কখনো নমনীয় এবং কখনো এতটাই কদর্য যে, তা ভাবতে বসলে আঁতকে উঠতে হয়। প্রাচীন যুগ থেকে আজ-অব্দি পুরুষ-শাসিত সমাজ-ব্যবস্থা ধরেই নিয়েছে যে, নারী পুরুষের মধ্যে এই যে ব্যবধান, এই যে পুরুষের প্রাধান্য এবং নারীর এই যে বশ্যতা এ যেন শাশ্বত, বিধির বিধান, চিরকালই ছিল, এখনো আছে আর অনাদি ভবিষ্যতেও চলবে বা থাকবে। এই রকমের একটা পূর্ব নির্ধারিত স্থির সিদ্ধান্ত চলে আসছে আবহমান কাল থেকে। আর তাই শুধু আমাদের দেশ নয় সকল দেশের মানুষ এই অবস্থাকে মনে-প্রাণে মেনে নিয়েছে সভ্যতা-বিকাশের বিভিন্ন স্তরে।

"তারই প্রতিফলন পড়েছে মানুষের মনে, ধ্যান-ধারণায়, চিন্তা-ভাবনায়, আবেগ-অনুভূতিতে, শিল্প-সাহিত্যে, কাব্য-সঙ্গীতে-সর্বত্রই। সমাজে নারীজাতির বৈষম্য-মূলক অবস্থানের প্রতিফলন পড়েছে সমাজমানসে, প্রতিফলন পড়েছে ব্যক্তিমানসেও।" (বাংলা কাব্যে নারীত্বের রূপায়ণ-কনক মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা-২)

মানব সমাজের জন্মলগ্ন থেকেই নারী পুরুষের চেয়ে হীন অবস্থায় ছিল, ছিল পরাধীন-এ কথা স্বয়ং এঙ্গেলস মার্কসবাদের সূত্র ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন- "That woman was the slave of man at the commencement of society is one of the most absurd notions that have come down to us from the period of Enlightenment of the 18th Century."- The Origin of Family, Private Property and the State- ফ্রেডারিক এঙ্গেলস।

ভারতীয় সাহিত্যে বিশেষ করে প্রাচীন সাহিত্যে নারীর যে হীনদশা তা আমাকে নেশার মত জড়িয়ে ধরল। ভারতবর্ষ মহান দেশ। মহান তার ব্যাপ্তি। সারা বিশ্বের চারটি মহাকাব্যের দুটিই ভারতবর্ষের- ক) রামায়ণ, খ) মহাভারত। এই মহাকাব্যের ভারতবর্ষের নারীর যে অবস্থান তা স্বল্প কথায় বলা দুষ্কর।

আমরা প্রায় সব সময় শুনতে পাই, পুরাণ, বেদ, গীতা, মহাভারত, ভাগবত, কোরান, তৌরাত, ইঞ্জিল প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ নাকি মানব জাতির কল্যানে রচিত। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসের দিকে দৃকপাত করলে আর বাস্তবের ভূ-মন্ডলে দাঁড়ালে একেবারে উল্টো চিত্র নজরে আসে। প্রতিটি ধর্মান্ধ ব্যক্তি নির্লজ্জভাবে মনে করেন একমাত্র তাঁদের ধর্ম-ই নাকি সাম্যবাদী, তাঁদের ধর্মই সবচেয়ে বড় সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করে, মানবতা আর ন্যায় বিচারের শিক্ষা দেয়। তবে ইতিহাস কিন্তু ভিন্ন সাক্ষ্য দেয় জগতে ধর্মের নামে যত অন্যায়, অবিচার, রাহাজানি, নিষ্ঠুরতা, বীভৎসতা, জঘন্যতা, রক্তপাত,

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে প্রাচীন কোচবিহারে দাস ব্যবসা

দেবজিৎ দত্ত

দাস শব্দটির আভিধানিক অর্থ বিভিন্ন হলেও সামগ্রিক অর্থে 'দাস' শব্দটির দ্বারা কোন কিছুর প্রভাবাধীন থাকা বা বশ্যতা স্বীকারকে বোঝায়, অর্থাৎ দাস শব্দটি একটি অধীনতা বা আজ্ঞাবাহিকতার দিকে ইঙ্গিত করে। ইউরোপীয় সামন্ততান্ত্রিক ভূমিব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে যদিও ভারতবর্ষে দাস ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটেনি কিন্তু প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন প্রামাণ্য ঐতিহাসিক উপাদান থেকে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, ভারতীয় সভ্যতার উন্মেষের আদি পর্ব থেকেই দাস ব্যবস্থা বা দাস ব্যবস্থার অনুরূপ বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন রীতি বিদ্যমান ছিল।[১] সনাতন ভারতীয় ব্রাহ্মণ্য সামাজিক স্তর বিন্যাসটিকে পর্যবেক্ষণ করলে দেখতে পাওয়া যায় ভারতীয় সমাজ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই চারটি ভাগে বিভক্ত এবং শূদ্র এখানে উপরোক্ত তিনটি শ্রেণীর সেবায় নিয়োজিত। [২] যদিও শূদ্রদের দাস-এর স্তরে নামিয়ে আনার অনেকে বিরোধীতা করেছেন,[৩] কিন্তু শূদ্রদের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অবস্থান তাদের প্রান্তিকতার দিকে ইঙ্গিত করে এবং সহজভাবেই তাদের দাসদের অনুরূপ বা দাস বলে প্রতিপন্ন করা যায়।

সুদুর প্রাচীন কাল থেকে পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের মতোই হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত রাজন্য শাসিত কোচবিহার রাজ্যে দাস ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল।[৪] তবে কোচবিহারে ঠিক কোন সময় থেকে দাস ব্যবস্থা চালু হয়েছিল সেই সংক্রান্ত কোনো সুস্পষ্ট তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না, কিন্তু একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় কোচবিহার রাজ্য প্রতিষ্ঠার বহুপূর্ব থেকেই অর্থাৎ প্রাচীন কামরূপ রাজ্যের অংশ হিসাবে অবস্থানকালীনও এই অঞ্চলে দাস প্রথার প্রচলন ছিল।

কোচবিহারে ঠিক কোন সময় থেকে দাস প্রথার উদ্ভব হয়েছিল যদিও তা একটি বিতর্কের বিষয়, কিন্তু কিছু ঐতিহাসিক ঘটনা এ অঞ্চলে দাস ব্যবস্থার ক্রম বিকাশকে বুঝতে সাহায্য করবে। যেমন গোসানীমঙ্গল কাব্যে রাজা কান্তেশ্বরের শিশুকালে তাঁর পিতা ভক্তিশ্বরের মৃত্যু হলে এক দ্বিজের দাস হিসাবে তাঁর রাখাল জীবনযাপনের বর্ণনা আছে। পরে তার দাসত্বমোচন হয় এবং তিনি রাজা হন।[৫] এই রাজা চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীতে কামতা রাজ্যে খেন বংশের প্রতিষ্ঠা করেন এবং কামতাপুরের বিশাল রাজধানী ও দুর্গ (গড়) তাঁর দ্বারা নির্মিত বলে অনুমান করা হয়। আবার মহারাজা নরনারায়ণের রাজত্বকালে তাঁর সমসাময়িক মহাপুরুষ শঙ্করদেব নিজে রাজপ্রাপ্য পরিশোধ করতে না পেরে দাসে পরিণত হয়েছিলেন বলে জানা যায়।[৬] পরবর্তীকালে তিনি নিজেও তার পারিবারিক কাজকর্মের জন্য দাসেদের নিযুক্ত করেছিলেন। আবার মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের সময় আগত স্টিফেন ক্যালিকো কোচবিহার থেকে পার্শ্ববর্তী ভূটানে পুরুষ এবং স্ত্রী দাসেদের পাঠানোর কথা উল্লেখ করেছেন। উপরোক্ত নিদর্শন গুলি প্রমাণ করে ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে কোচবিহারে দাস প্রথা বিদ্যমান ছিল।

কোচবিহারে দাস ব্যবস্থা উদ্ভবের ক্রমবিকাশের কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে দেখতে পাওয়া যাবে যে মূলত দরিদ্র এবং অভাবের তাড়নায় মানুষ নিজেকে বিক্রি করতে বাধ্য হোত। কোচবিহার রাজ্যের রাজারা যেহেতু ব্যবসা বাণিজ্যের উপর বিশেষ নজর দেন নি, তাই এই রাজ্যের বহুমুখী অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটেনি এবং অধিকাংশ মানুষ ছিল কৃষিজীবী। [৭] ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা ছিল প্রচুর। এইরূপ অবস্থায় অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ্য, মহামারীর পাশাপাশি রাজকর্মচারীদের বৈরী মনোভাবে সাধারণ মানুষের অবস্থা ছিল কঠিন। তাই এই সময় মানুষের নিজেকে বিক্রি করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

সুদূর প্রাচীনকাল থেকেই দাস-দাসী পোষণ করা আভিজাত্যের প্রতীক হিসাবে গণ্য হয়ে এসেছে, কোচবিহারও এর ব্যতিক্রম ছিল না। সম্ভ্রান্ত পরিবারের দাস দাসীদের সংখ্যা সেই

স্কট পরিবার, লুসিস্কট ও রবীন্দ্রনাথ

দিগ্বিজয় দে সরকার

আঠারো বছর বয়সের তরুণ রবি এলেন লন্ডনে আইন পড়তে ১৮৭৯ সালে। এবারে এখানে তিনি ছিলেন ১৮৭৯-এর জুন থেকে সম্ভবত ফেব্রুয়ারী, ১৮৮০ পর্য্যন্ত প্রায় এগার মাস। রবীন্দ্র নাথ তখন সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণ আনন্দকান্তি যুবক। মেজদা সত্যেন্দ্রনাথ রবিকে বিলেত পাঠানোর আগে কিছুটা আদব কায়দা শিখিয়ে পালিশ করিয়ে নিয়েছেন। বোম্বাইয়ের মেয়ে আন্না তড়খড়-এর কাছে ৩৩ দিনে রবি মেয়েদের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে শিখেছেন। রোমাঞ্চ অনুভব করেছেন, চুম্বনের প্রলোভন জয় করেছেন। অথচ পরবর্তী সমস্ত জীবন এই মেয়েটিকে তিনি মনেও রেখেছেন, নামকরণও করেছেন 'নলিনী'।

লন্ডনে স্কট পরিবারে বাস করতে এসে আন্নার দেওয়া তালিম কি কবির কাজে এসেছিল ?

আসলে রবীন্দ্র নাথের জীবনে নানা বয়সের নারীদের নিয়ত আনাগোনা। এনিয়ে নানা জনের নানা কথা- কাব্য-উপন্যাস রচনা। অতিকথনের চূড়ান্ত সে সব। আর হবেই বা না কেন? এমন মানুষ পৃথিবীতে কমই দেখা যায়। রবীন্দ্র কাব্যে যাঁদের মন আছে তাঁরা জানেন কবির এই অভিজ্ঞতা তাঁর জীবনের সহস্র সঞ্চয়ের এক বড় দিক। এর স্বীকৃতি তাঁর কাব্য-কবিতায়, লিখায় আঁকায় সর্বত্র। 'পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারীতে' তিনি তাই লেখেনঃ 'কিশোর বয়সে যাঁরা আমাকে কাঁদিয়েছিল, হাসিয়েছিল, আমার কাছ থেকে আমার গান লুট করে নিয়ে ছড়িয়ে ফেলেছিল, আমার মনের কৃতজ্ঞতা তাদের দিকে ছুটল। তারা মস্তবড় কিছু নয়, তারা দেখা দিয়েছে কেউ বা বনের ছায়ায়, কেউ বা নদীর ধারে, কেউ বা ঘরের কোনে, কেউ বা পথের বাঁকে। আমি তাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললুম, "আমার জীবনে যারা সত্যিকার কালি ফলিয়েছে, সেই আলোর সেই উত্তাপের দূত তোমরাই। প্রণাম তোমাদের। তোমাদের অনেকেই এসেছিল ক্ষণকালের জন্য, আধোসূক্ষ্ম, আধো জানার ভোরবেলায়, শুক্ক তারার মতো, প্রভাত না হতেই অস্তগেল।"

কিন্তু রবীন্দ্র নাথের কাছে রাতের সব তারাই আছে দিনের আলোর গভীরে। এরাই কবির কাব্য দেহের সৌরভ, 'বেদনাপদ্মের বীণাপাণি'। এঁরাই আন্না, এঁরাই লুসি, এঁরাই ওকামপো। ঠাকুর পরিবারের যোগ্য সদস্য তৈরী হতে এসেছেন লন্ডনে তরুণ রবি। যে পরিবারে তাঁকে অনেক দিন আতিথ্যগ্রহন করতে হয় তা স্কট পরিবার। জীবনস্মৃতি ও য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি'তে কবির সরস বর্ণনা এ প্রসঙ্গে লভ্য। কবিরমুখ থেকেই শোনা যাক সেই স্মরনীয় অভিজ্ঞতার অংশ বিশেষ 'এবারে ডাক্তার স্কট নামে একজন ভদ্র গৃহস্থের ঘরে আশ্রয় জুটিল। এক দিন সন্ধ্যার সময় বাক্স তোরঙ্গ লইয়া তাঁহাদের ঘরে প্রবেশ করিলাম। বাড়িতে কেবল পক্ককেশ ডাক্তার, তাহার গৃহিণী ও তাঁদের বড় মেয়েটি আছেন। ছোটো দুইজন মেয়ে ভারতবর্ষীয় অতিথির আগমন- আশঙ্কায় অভিভূত হইয়া কোনো আত্মীয়ের বাড়িতে পলায়ন করিয়াছেন। বোধকরি যখন তাঁহারা সংবাদ পাইলেন, আমার দ্বারা কোনো সাংঘাতিক বিপদের আশু সম্ভাবনা নাই তখন তাঁহারা ফিরিয়া আসিলেন। অতিঅল্প দিনের মধ্যেই আমি ইঁহাদের ঘরের লোকের মতো হইয়া গেলাম। মিসেস স্কট আমাকে আপন ছেলের মতই স্নেহ করিতেন। তাঁহার মেয়েরা আমাকে যেরূপ মনের সঙ্গে যত্ন করিতেন তাহা আত্মীয়দের কাছ হইতেও পাওয়া দুর্লভ।'

য়ুরোপ প্রবাসীর পত্রে লিখছেন- 'মিসেস স্কট আমাকে অতিরিক্ত যত্ন করেন। শীতের সময় আমি বিশেষ গরম কাপড় না পরলে তাঁর কাছে ভর্ৎসনা খাই। খাবার সময় যদি তাঁর মনে হয় আমি কম করে খেয়েছি, তা হলে যতক্ষণ না তাঁর মনের মত খাই ততক্ষণ পীড়া পীড়ি করেন।' রবির ভাগ্যকে ঈর্ষা করতে ইচ্ছে করে। কিন্তু ভাললাগা-ভালোবাসার এখানেই শেষ নয়। গৃহকর্ত্রীর মেয়েরা কিন্তু রবির ব্যবহারে মুগ্ধ, বিশেষ করে মেয়ে লুসি। রবি সঙ্গে তাঁর চোখে চোখে কথা হয়। পড়াশুনোর পর গভীর রাত পর্য্যন্ত উভয়ে সঙ্গীত চর্চা করেন। লুসির পিয়ানো বাদনের সঙ্গে রবির

জলপাইগুড়ি ঃ ইতিহাসের পথে- উপন্যাসের পাতায়

ডঃ সুলেখা পন্ডিত

পৃথিবীর প্রত্যেক ভৌগোলিক স্থানে লগ্ন হয়ে থাকে তার অতীতের বাতাবরণ। কোথাও মানুষ নির্মিত- কীর্তির সাহায্যে স্থান মাহাত্ম্যকে চিরস্থায়ী করে রাখে, কোথাও শুধু প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনের বৈশিষ্ট্য, কোথাও জনশ্রুতি তথা ঐতিহাসিকতা চিরকাল ধরে মানুষকে তার অতীতের স্মৃতি মনে করিয়ে দেয়। আমরা ইতিহাস সম্পর্কে বরাবরই ছিলাম অত্যন্ত উদাসীন। ভারতবর্ষের তথ্য সমৃদ্ধ ইতিহাস আত্মগোপন করে আছে তার পুরাণ, সাহিত্য ও অন্যান্য কীর্তির মধ্যে। এই ইতিহাসকে আমাদের খুঁজে বের করতে হয়।

কোনো কালেই বিদেশাগত আক্রমনকারীদের নির্বিচারে মেনে নেয়নি আমাদের দেশের জনগণ। তাদের স্বাধীন সত্তা বারবার বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। ইংরেজ শাসিত পরাধীন ভারতবর্ষে স্বাধীনতার স্পৃহা যখন নতুন করে আমাদের রক্তে দোলা দিয়ে গেল তখন আমরা আমাদের দূর অতীত ও নিকট অতীতের বিদ্রোহের ঘটনাগুলোকে নতুন করে স্মরণ করলাম। অতীতের গৌরবগাথা শৌর্য-বীর্যের কাহিনীগুলো হতে বিপ্লবের প্রাণ-প্রেরণা খুঁজে পেতে শুরু করলাম।

এই ইতিহাসের ঘটনাকে কিছু কল্পনার মোড়কে জীবন্ত করে বিপ্লবী প্রাণের তন্ত্রীতে রণিত করে দিয়েছিলো দু'টি উপন্যাস—'আনন্দমঠ' [১] ও 'দেবী চৌধুরাণী' [২]। যাদের ইতিহাসকথা বিধৃত হয়ে আছে বরেন্দ্র ভূমির জল-জঙ্গল-জনগণের মনে। দু'টি উপন্যাসেরই বাস্তবতা বিলগ্ন হয়ে আছে জলপাইগুড়ি জেলার গায়ে। ব্রিটিশ শাসিত পরাধীন ভারতবর্ষে অবিভক্ত উত্তরবাঙলার জনগণ যে বিদ্রোহে সামিল হয়েছিলেন তাকে অমর করে রেখেছেন বঙ্কিমচন্দ্র [৩]। জলপাইগুড়ি জেলার ভৌগোলিক প্রেক্ষাপটে ছড়িয়ে আছে মুক্তিপ্রয়াসী জনগণের এক কালের বিদ্রোহের ঐতিহ্য। এই বিদ্রোহে বরেন্দ্রভূমির দরিদ্র কৃষকেরা অন্ন বস্ত্রের জন্য ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং এই বিদ্রোহীরা সন্ন্যাসী ও ফকিরের বেশ ধারণ করেন। সন্ন্যাসী এবং ফকিরের বেশ ধারণ করার কারণ ইংরেজ শাসকের আগ্নেয়াস্ত্রের বিরুদ্ধে লড়বার মত অস্ত্র তাদের ছিল না, তাই এ ছদ্মবেশ তাদের নিরাপদে চলতে ফিরতে যেমন সহায়ক হয়েছিল, তেমনি মানুষের কাছে সঙ্কট পরিত্রাতার রূপকল্প হিসেবে গৃহীত হয়েছিল। ইতিহাস পাঠে জানা যায় এই বিদ্রোহীদের নায়ক ছিলেন ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরানী। ব্রিটিশের ঔপনিবেশিক শাসন থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের বিভীষিকা ভূমি থেকে জাগ্রত হয়েছিলেন এই সমস্ত পরিত্রাতা। অত্যন্তহারে রাজস্ব আদায়, কৃষকদের জমি থেকে উচ্ছেদ, গ্রাম সমাজের ধ্বংস প্রাপ্ত অবস্থা, দুর্ভিক্ষ-মহামারীর প্রকোপে সর্বস্বান্ত কৃষকেরা এই সমস্ত নেতা ও সন্ন্যাসীদের ডাকে সংঘবদ্ধভাবে অস্ত্রধারণ করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদে গ্রাম বাঙলার নিদারুণ দূরবস্থার কথা তুলে ধরেছেন- "লোকে প্রথমে ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল, তারপরে কে ভিক্ষা দেয় !- উপবাস করিতে আরম্ভ করিল। তারপরে রোগাক্রান্ত হইতে লাগিল। গোরু বেচিল, লাঙ্গল জোয়াল বেচিল, বীজধান খাইয়া ফেলিল, ঘরবাড়ি বেচিল। জোতজমা বেচিল। তারপর মেয়ে বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর ছেলে বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর স্ত্রী বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর মেয়ে, ছেলে স্ত্রী কে কিনে ? খরিদ্দার নাই, সকলেই বেচিতে চায়। খাদ্যাভাবে গাছের পাতা খাইতে লাগিল। ইতর ও বন্যেরা কুক্কুর, ইন্দুর বিড়াল খাইতে লাগিল। অনেকে পলাইল, যাহারা পলাইল, তাহারা বিদেশে গিয়া অনাহারে মরিল। যাহারা পলাইল না, তাহারা অখাদ্য খাইয়া, না খাইয়া রোগে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল।"

এই সন্ন্যাসী বিদ্রোহের সময়কাল ছিল ১৭৬৩ থেকে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ। সন্ন্যাসীদের মুখে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনিও শোনা যায়। জলপাইগুড়ির সন্ন্যাসীডাঙা, সন্ন্যাসীকাটা (বর্তমান রাজগঞ্জের

©
EAST INDIAN SOCIETY FOR THE STUDIES OF SOCIAL SCIENCE
Registration No. : S/IL/79269 (2011)
Sovaganj, P.O. Alipurduar, Dist. Jalpaiguri, Pin. 736121
Contact : E-mail. eastindiansociety@yahoo.in
Web. www.eastindiansociety.org
Printed by : Manindra Printers & Publishers, Alipurduar.